মধ্যযুগে শাসকবৃন্দের বর্বরতা

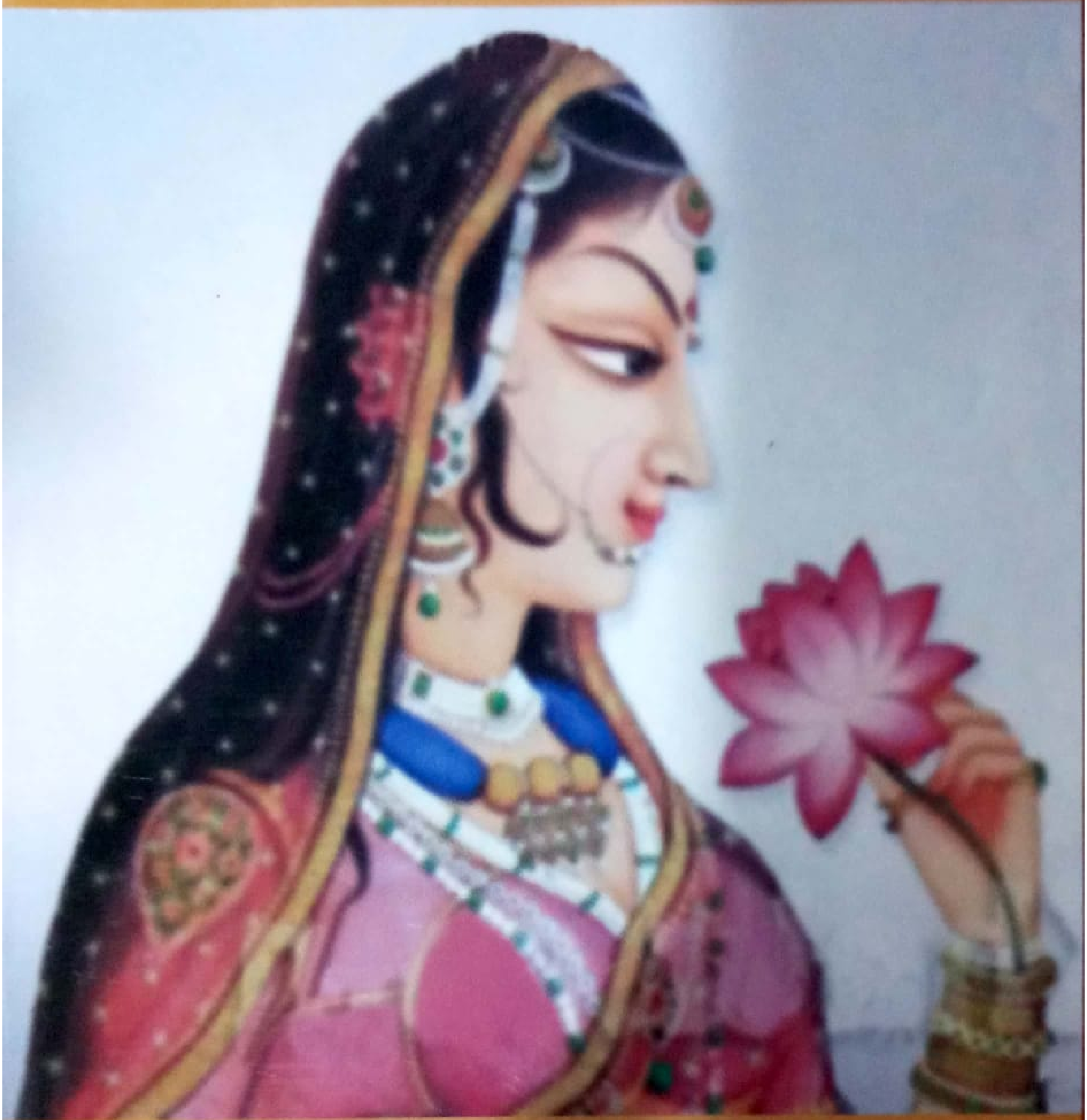

জনার্দন মণ্ডল

Scanned by CamScanner

মধ্যযুগে শাসককুলের বর্বরতা

জনার্দন মণ্ডল

জীবক প্রকাশনী
কলকাতা-১৫০
দূরভাষ ঃ (০৩৩)২৪৩৪৬১৪০, ৯০৭৩৫৫৯৮৬০

Scanned by CamScanner

প্রকাশক : বিশ্বরূপ মণ্ডল
এস-৫/১৭, এ. পি. নগর,
সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৫০

প্রথম প্রকাশ : ১৪ই এপ্রিল, ২০১৮

গ্রন্থসত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : মলিনা মণ্ডল

মুদ্রক : বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩১/১এ, নবীন চাঁদ বড়াল লেন
কলকাতা-৭০০০১২
দূরভাষ : (০৩৩) ২২১৯-৬৮৩৮
চলভাষ : ৯৮৭৪৮৩৪৩৬৪

প্রাপ্তিস্থান :

বিশ্বরূপ মণ্ডল
এস-৫/১৭, এ. পি. নগর,
সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৫০
বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩১/১এ, নবীন চাঁদ বড়াল লেন
কলকাতা-৭০০০১২

মূল্য : ১৫০ টাকা

Scanned by CamScanner

ঃ উৎসর্গ ঃ

পরমারাধ্য

স্বর্গীয় পিতা

সহদেব মণ্ডল ও স্বর্গীয় মাতা ঝরি মণ্ডল-এর

স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

Scanned by CamScanner

মুখবন্ধ

মধ্যযুগের সাধারণ ইতিহাস সম্পর্কে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের কমবেশী ধারণা আছে। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রদত্ত পাঠ্যতালিকা অনুসারে ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করতে হয়। অনেক কৌতুহলী পাঠকপাঠিকাগণ ইতিহাসের আরোও বিভিন্ন তথ্য সম্বন্ধে আগ্রহী যা শিক্ষালয়ের প্রদত্ত পাঠক্রমের বর্হিভূত। বর্তমান গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার ইতিহাসের সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকের ঘটনাবলী সন্নিবেশিত করেছেন, যার থেকে ১০০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগের শাসককুলের নৃশংসতা, নারীলোলুপতা, ব্যাভিচার, ধর্ষণ ও খুনের কাহিনী সম্বন্ধে অনেক কিছু অজানা তথ্য উন্মোচিত হয়েছে। সাধারণভাবে বেশীরভাগ ইতিহাস লেখকগণ এইসব শাসককুলের প্রশংসা, কোন কোন ক্ষেত্রে ভূয়সী প্রশংসা করে ইতিহাস লিখেছেন, যার বেশীরভাগ ইউরোপীয় বা পাশ্চত্যের ইতিহাসবিদ বা লেখকদের অনুকরণে লেখা। কিন্তু এইসব শাসক, সম্রাট, বাদশাহ বা রাজন্যবর্গের অনেকে সে রূপ প্রশংসার যোগ্য নহেন, এই সম্রাট তীক্ষ্ণ কূটনীতিক, ওই সম্রাট দক্ষ প্রশাসক, অন্য সম্রাট বীরযোদ্ধা বা যুদ্ধ কৌশলী বা দিগ্বিজয়ী বীর বা নিপুণ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ইত্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে সত্যিকারের সুযোগ্য শাসক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

গ্রন্থকার নিজস্ব এবং একক প্রচেষ্টায় এঁদের বর্বরতার, নৃশংসতার, নারীলোলুপতার, ধর্ষণ বা নরহত্যার মত জঘন্য ইতিহাস অনেক পরিশ্রম করে সন্নিবেশিত করেছেন ও পাঠকপাঠিকাদের সামনে তা তুলে ধরেছেন।

বিষয়গুলি যত্ন সহকারে পড়ে বিশ্লেষণ করলে পাঠকপাঠিকাদেরও বিচলিত হতে হবে যে, এঁরা সুশাসক হওয়ার যোগ্য কিনা। কিন্তু বিস্ময়ের এই যে, এইসব অযৌক্তিক প্রশংসা মণ্ডিত ইতিহাস আমাদের পড়তে হয়, পড়তে শেখান হয়, শুধু শিক্ষালয়ের পাঠ্যবস্তু হিসাবে নয়

যারা ভবিষ্যতের দেশের পরিচালিকাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন, ডব্লিউ. বি. সি. এস. বা আই. এ. এস. উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী প্রশাসনে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদেরও ইতিহাসের নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রায় একই বিষয় পড়তে হয়। জমিব্যবস্থা, কৃষিব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্থাপত্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর জোর বর্ণনা থাকলেও সভ্যতার ইতিহাসের বর্বরতার দিককে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয় নি, এইসব বর্বর শাসকদের অনেককেই আজও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে জাঁকজমক সহকারে সরকারী কোষাগার থেকে—যা জনগণের অর্থপুষ্ট—প্রভূত অর্থব্যয়ে তাদের জন্মোৎসব ইত্যাদি পালিত হয়, যা বিশেষ বার্তা বহন করে। যে দেশের মানুষ স্বাধীনতার এত বছর পরেও অর্ধাহারে, অনাহারে ও অত্যাচারে মৃত্যুমুখে পতিত হয় সে দেশের পক্ষে এ প্রকার উৎসব বিভ্রান্তিকর ও বিতর্কমূলক, যা এড়িয়ে চলা সম্ভব।

গ্রন্থটিতে এই সমস্ত শাসককুলের ইতিহাস মধ্যযুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কোথাও কোথাও ঘটনাক্রমে মধ্যযুগের সঙ্গে যুক্ত প্রাচীন যুগ বা আধুনিক যুগের সমপ্রকার ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়া হলেও বিষয়টিতে মধ্যযুগের বর্বরতার কথাই প্রাধান্য পেয়েছে।

সব ধরণের পাঠকপাঠিকাদের জন্য গ্রন্থটি রচিত। পাঠকপাঠিকাগণ গ্রন্থটি পড়ে উপকৃত হলে গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হবে। গ্রন্থটির পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের জন্য পাঠকপাঠিকাগণের মতামত ও পরামর্শ সমাদরে গ্রহণযোগ্য ও বিবেচ্য।

কলকাতা-৭০০১৫০ — জনার্দন মণ্ডল
নভেম্বর, ২০১৭

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রথম অধ্যায়	
সুলতান মামুদ, সোমনাথের মন্দির, দেবদাসী ও ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রচার।	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	
তৈমুরলঙ্গ, চেঙ্গিস খাঁ ও রিজিয়া সুলতানা	১৯
তৃতীয় অধ্যায়	
আলাউদ্দিন খলজী, মালিক কাফুর, পদ্মিনী, কমলাদেবী ও দেবলাদেবী।	২৩
চতুর্থ অধ্যায়	
রাজ পৃথ্বীরাজ, রাজা জয়চন্দ্র ও সংযুক্তা।	৩০
পঞ্চম অধ্যায়	
বিজয়নগর রাজ্যের সামাজিক অবস্থা, মহিলাদের করুণ অবস্থা, মাহমুদ খলজী ও চিতোরের রানা কুম্ভ।	৩২
ষষ্ঠ অধ্যায়	
মুসলমান সংগঠন, নামদেব, কবীর ও নানক।	৩৫
সপ্তম অধ্যায়	
বাবর, হুমায়ুন, আকবর, সালিমা বেগম, রানা প্রতাপ, বজবাহাদুর রূপমতি, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও মমতাজ এবং ঔরঙ্গজেব, তাজমহল, কোহিনুর, ও ময়ূর সিংহাসন।	৩৯

Scanned by CamScanner

বিষয়

মানচিত্র পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৪

চিত্রাবলী ৬৫—৭২

মক্কা শরিফের চিত্র, সোমনাথ মন্দিরের চিত্র,
রিজিয়া সুলতানার চিত্র, রাণী পদ্মিনীর চিত্র,
কবীর ও নানকের চিত্র, সুলতানী আমলের মুদ্রা,
মহম্মদ তুঘলকের মুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা, বজবাহাদুর ও
রূপমতির চিত্র, কোহিনুরের চিত্র, তাজমহলের চিত্র,
ময়ূর সিংহাসন, মুর্শিদাবাদের ১৮ জন নবাব ও
নিজামের ছবি, হাজার দুয়ারী, ইমাম বারা,
কাটরা মসজিদ ও জাহানকোষা, কামানের ছবি,
মুর্শিদাবাদের নবাবদের ক্রম পর্যায়।

অষ্টম অধ্যায়

সিরাজউদ্দৌল্লা, উমদাতুন্নিসা, লুৎফুন্নেসা ও
জগৎশেঠের কন্যা।
মুর্শিদাবাদের নবাবদের ক্রমপর্যায়, টিপু সুলতান,
সুন্দরী উন্নিযার্চ ও দেওয়ান পূর্ণৈয়ার কন্যা। ৭৩

তথ্যগত গ্রন্থপঞ্জী ৮৫

নির্ঘণ্ট ৮৬

প্রথম অধ্যায়

সুলতান মামুদ, সোমনাথের মন্দির, দেবদাসী ও ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রচার

প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতবর্ষ রাজা মহারাজার দেশ। ভারতবর্ষকে নিয়ে দেশ, বিদেশ এবং সাধারণ মানুষের কৌতুহল কম নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। প্রাচীন যুগ হিন্দু যুগ, মধ্যযুগ মুসলমান ও আধুনিক যুগ বৃটিশ। প্রাচীন যুগ ও মধ্য যুগ প্রধানতঃ রাজবংশের বিবরণ। এই সময়ে ধীরে ধীরে একটি নতুন ধারা-সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব হয়, সামন্ততন্ত্র বা Feudalism ল্যাটিন শব্দ feudum থেকে উৎপন্ন যার ইংরাজী নাম fief। নিজস্ব সেনাবাহিনী নিয়ে বিশাল এলাকার প্রধান হিসাবে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই সামন্ত প্রভুরা।

১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ খিবা দখল করেন। আর রিহান যিনি আল-বেরুনী নামে প্রসিদ্ধ—তিনি খিবাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে তিনি খারাজামের অভিযান থেকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন। আলবেরুণীর বিবরণ থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষ খণ্ডিত ও বহুধা বিভক্ত ছিল, এবং এক একটি খণ্ডিত অংশের প্রধান (Chief বা fief) ছিল। সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, শিশু বিবাহ চলত, বিধবাদের পূণর্বিবাহ হত না। নির্দয়ভাবে স্বামীর চিতায় বলপূর্বক পুড়িয়ে মারা হত যাকে সতীদাহ বলা হত আর তাকে 'সতী' বলে আখ্যায়িত করা হত যেন একটি পূণ্যের কাজ। কম বয়সের মহিলারাও এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত না। এটি প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। তিনি লিখেছেন ... "The Vulgar people were polytheists". জঘন্য অপরাধের জন্য 'মৃত্যুদণ্ডের' ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এই সমস্ত অপরাধের মূল সংঘটক ব্রাহ্মণরা এই মৃত্যদণ্ডের আওতার বাইরে নিজেদের মুক্ত

Scanned by CamScanner

রাখল, তার ফলে তারা যথেচ্ছ ব্যভিচার করতে ভয় পেত না। অপরাধের মাত্রা অনুসারে দেহের অঙ্গ কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রজাদের উপর থেকে কর সংগ্রহ হলেও ব্রাহ্মণরা তাদেরকে করদান থেকে মুক্ত রেখেছিল। আল-বেরুণীর বর্ণিত পাতায় পাতায় ভারতবর্ষের অবনতি, অধঃপতন ও আপজাত্যের বহু প্রামাণ্য তথ্য প্রদান করেন। রাজনৈতিক বিভেদ ও পরস্পরের মধ্যে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ লেগে থাকত। জাতীয়তাবোধহীনতা তাদের মধ্যে ছিল প্রবল। জাতীয় ঐক্যের কোন মূল্য ছিল না তাদের কাছে। সম্ভবতঃ 'Nationality' শব্দের কোন অর্থ তাদের কাছে অজানা ছিল। কুসংস্কারে ধর্ম সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। সমাজ সম্পূর্ণ দৃঢ় জাতিভেদ প্রথায় আবদ্ধ ছিল। যার পরিণতি স্বরূপ বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্য একেবারে অসম্ভব ছিল। শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতীয় সমাজ ক্ষয়প্রাপ্ত এবং জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় জীবন একেবারে অবলুপ্ত। সবচেয়ে বিস্ময়ের মধ্যযুগের সাত আটশত বছর পরেও এখনও সেই জাতীয় হানাহানি, অস্পৃশ্যতা বিদ্যমান। বিজ্ঞানী ও মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত আল-বেরুণী তাঁর কুতুব-উল-হিন্দ বইয়ে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের বিজ্ঞানবিমুখতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আরোও বলেছেন ভারতীয় ব্রাহ্মণরা ছিলেন উদ্ধত, নির্বোধ, দাম্ভিক, আত্মাভিমানী ও অবিচলিত। তাদের অর্জিত জ্ঞান বিদেশী তো দূরের কথা, নিজেদের দেশের ভিন্ন জাতির মধ্যে যাতে না ছড়ায় সেদিকে কড়া নজর রাখত। এরা কর্মবিমুখ এবং পরাশ্রয়ী।

সুলতান মামুদ (ইয়ামিন্ আল্-দৌলা আবুল কাশিম্ মামুদ ইবন্ সেবুক্তিগিণ—(জন্ম ৯৭১, মৃত্যু ৩০ এপ্রিল? ১০৩০) তুর্কী ক্রীতদাস সেবুক্তিগিনের পুত্র। ৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে সেবুক্তিগিন গজনীর শাসক হন। ৯৯৮ খ্রীস্টাব্দে ২৭ বছর বয়সে পিতার স্থলে অভিষিক্ত হয়ে মামুদ গজনীর সুলতান হন। মামুদ ২০টি সার্থক অভিযান চালান, তার মধ্যে ১৭টি অভিযানই ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের মধ্যে স্থায়ী অর্ন্তদ্বন্দ্ব এবং মন্দিরগুলির মধ্যে অবিশ্বাস্য রকমের অপরিমিত সম্পদের হদিস তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। গজনীকে সমৃদ্ধশালী, বাগদাদের তুলনায় আরো কৃষ্টি সম্পন্ন রাজ্যে পরিণত করার জন্য তাঁর ছিল বিপুল সম্পদের

Scanned by CamScanner

প্রয়োজন। প্রভূত পরিমান সম্পদ তিনি তাঁর অভিযানগুলি থেকে সংগ্রহ করেন।

ভারতবর্ষে ১০০১ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবের শাহিয়া শাসক জয়পালকে আক্রমণ করে পরাস্ত করেন। জয়পাল অপমানে নিজের চিতা নিজে সাজিয়ে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করেন। তাঁর পুত্র আনন্দপাল পাঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহন করেন। আনান্দাপালকেও হারিয়ে তিনি ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার সাহস পেলেন। ভারতবর্ষে তিনি কোন স্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠার অভিলাষী ছিলেন না। গজনী আফগানিস্থান এবং উত্তরপূর্বে ইরানের মধ্যবর্তী রাজ্য। মামুদের রাজ্য জয়ের ফলে উত্তরপশ্চিম ভারতের এবং ইরাণের কিয়দংশ সংযুক্ত হয়। পাঞ্জাব গজনীর অন্তর্গত হয়। ১০২৪ খ্রীস্টাব্দে মামুদ ভারতে সর্বশেষ সতেরতম বিখ্যাত অভিযান চালান। ১০২৫ খ্রীস্টাব্দে আরব সাগর বরাবর গুজরাটের কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে আসেন এবং এই কাথিয়া ওয়াড়ের বরাবর গুজরাটের কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে আসেন এবং এই কাথিয়াওয়াড়ে ছিল বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির। বিখ্যাত এই মন্দির লুঠ করে ধ্বংস করেন এবং ১০২৬ খ্রীস্টাব্দে ফিরে যান।

ভারতবর্ষের মন্দিরগুলিতে প্রচুর টাকা, সোনা, ও মূল্যবান ধাতব মূর্তি, গহনা ও সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে মামুদ ১০১০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১০২৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত লাগাতার মথুরা, থানেশ্বর, কনৌজ এবং সোমনাথের মন্দিরগুলি লুঠ করেন। গোঁড়া মুসলমানরা দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করা পূণ্যকর্ম বলে মনে করত। মামুদের রাজসভার ঐতিহাসিক উতবি (Utbi) তার বর্ণনায় মথুরা অঞ্চলে এক হাজার মন্দিরের অস্তিত্বের কথা বলেন। তার মধ্যে প্রধান মন্দিরের সৌন্দর্য্য ছিল অনুপম ও অতুলনীয়। সমস্ত লেখকের কলম এবং সমস্ত চিত্রকরের পেনসিল এই বর্ণনা দিতে অসমর্থ এবং অক্ষম। তাঁর প্রাক্কলন হিসাব মত প্রধান মন্দিরটির মূল্য দশ কোটি দিনার (ইসলামীয় স্বর্ণমুদ্রা) এবং মন্দিরটি তৈরি করতে অন্ততঃ দু'শত বছর সময় লেগেছে। এর পাঁচটি প্রধান মূর্তির প্রত্যেকটির উচ্চতা পাঁচ মিটার, লাল সোনার তৈরি এবং একটির রুবির তৈরি চোখ যার মূল্য পঞ্চান্ন হাজার দিনার।

Scanned by CamScanner

মথুরা কনৌজের মন্দিরগুলো অবাধে লুঠ করেন এবং প্রচুর প্রতিরক্ষাবিহীন নিরস্ত্র নাগরিকদের নিহত করেন।

এই সমস্ত অভিযানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিযান হল সোমনাথ মন্দির আক্রমণ ও লুঠ, যা আজও হিন্দুদের স্মৃতিপথে উদয় হয় ও তাদেরকে প্রভাবিত করে। মন্দিরের মধ্যস্থলে সোমনাথ নামক দেবতার মূর্তিটি রাখা ছিল। দেবমূর্তিটি শূন্যে ভাসমান অবস্থায় ছিল। সকলের কাছে এটি ছিল বিস্ময়ের বিষয়। চন্দ্রগ্রহণের সময় দুই থেকে তিন লক্ষ হিন্দুরা মন্দিরে তীর্থ করতে জমায়েত হত। দশ হাজারেরও বেশি গ্রাম মন্দিরের রাজস্ব হিসাবে দান করা হয়েছিল। 'গঙ্গা' নামক পবিত্র নদীর থেকে সোমনাথের দূরত্ব ছিল ২০০ 'পারসাঙঃ'; প্রতিদিন ওই নদীর জল নিয়ে মন্দিরটি ধৌত করা হত, দেবতার পূজা আর্চার জন্য এক হাজার ব্রাহ্মণ পূজারী ছিল। পাঁচ শত তরুণী দেবদাসী বা বারাঙ্গনা এই মন্দিরে নৃত্যগীত করত। বিশাল মন্দিরটি ছাপান্নটি সেগুন কাঠের স্তম্ভের উপর নির্মিত। স্তম্ভগুলি সীসা দিয়ে মোড়া। দেবতার কক্ষটি ছিল অন্ধকার। সেটি রত্নখচিত বহুমূল্য ঝাড়-লণ্ঠনের দ্বারা আলোকিত করা হত। কক্ষের মধ্যে ছিল একটি সোনার শিকল। শিকলটির ওজন ছিল ২০০ মন (১ মন = ৩৭কেজি, ২০০ মন = ৭৪০০ কেজি বা ৭৪ কুইন্টাল)। বিভিন্ন প্রহরে পূজারী ব্রাহ্মণদের সজাগ করার জন্য শিকলটি ঘণ্টার মত বাজান হত। মামুদ ধর্মযুদ্ধ শুরু করেন। সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে হিন্দুদের মুসলমান বানাতে উদ্যোগ নেন। মামুদ ১০২৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় এখানে আসেন। ভারতীয়রা মন্দির রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করেছিল। অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার লোক এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সুলতান মূর্তিটি দেখে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তার হিসাব তৈরি করতে আদেশ দিলেন। মন্দিরে সোনা ও রুপোর তৈরি অনেক মূর্তি ও রত্নখচিত পাত্র ছিল। ভারতের বিখ্যাত লোকেরা এগুলি মন্দিরে পাঠিয়েছিলেন। মন্দিরের বিভিন্ন দ্রব্য ও মূর্তিগুলির মূল্য হবে কুড়ি হাজার দিনারেরও বেশি। সুলতান এরপর তাঁর সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলেন, মূর্তিটি কি কৌশলে শূন্যে ভেসে আছে? কেউ কেউ

Scanned by CamScanner

বলল যে, নিশ্চয়ই কোন গোপন উপায়ে মূর্তিটি ভাসমান রয়েছে। তখন সুলতান একজনকে আদেশ দিলেন, বর্শা দিয়ে মূর্তিটির ওপর ও নীচের অংশ বিদ্ধ করে গোপন কৌশলটি উদ্ঘাটন করতে হবে। বর্শা কোন কিছুতেই বিদ্ধ হল না, একজন বলল, চন্দ্রাতপটির মধ্যে চুম্বক আছে এবং মূর্তিটি লোহার তৈরি, কারিগর এমন একটি কৌশল করেছে যার ফলে চুম্বকটির আকর্ষণে একেবারে উপরে উঠে না এসে শূন্যে অবস্থান করছে। কেউ কেউ অভিমতটি মেনে নিল। কেউ কেউ মানল না। এরপর অভিমত যাচাই করবার জন্য সুলতান চন্দ্রাতপ থেকে কয়েকটি পাথর সরিয়ে দিতে বললেন। দুটি পাথর সরানোর পরই মূর্তিটি একপাশে হেলে গেল। আরো কয়েকটি পাথর সরানোর ফলে মূর্তিটি আরো ঝুঁকে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত মাটির উপর কাত হয়ে পড়ল। (আল কাজউনি। অনুবাদ ঃ এলিয়ট ও ডাউসন, দি হিসট্রি অর ইণ্ডিয়া অ্যাজটোল্ড বাই ইটস্ ওন্ হিস্টোরিয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭)

১০৩০ খ্রীস্টাব্দে মামুদের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ভারতবর্ষ থেকে লুণ্ঠিত প্রভূত অর্থ দিয়ে গজনীতে গ্রন্থাগার, যাদুঘর ও মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর আদেশে আল বেরুণী ভারতবর্ষে দশ বছর কাটিয়েছিলেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই পণ্ডিতের লেখা বই 'তাহাকিক-ই—হিন্দ'-এ ভারতের সভ্যতা সম্পর্কে তীক্ষ্ণ ও গভীর মন্তব্য পাওয়া যায় (আলবেরুনি, তাহকিক-ই হিন্দ, অনুবাদ ঃ সাসাউ, আলবেরুণী)

সোমনাথের অর্থাৎ শিব বা মহাদেবের এই মন্দিরটি হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র। কিন্তু মামুদ এটি সম্পূর্ণ ভেঙে ধ্বংস করে দেয়। নাজিমের লেখা "সুলতান মামুদ" পুস্তকে (পৃঃ ১১৮) বর্ণনায় উল্লেখ আছে, "যখন তিনি সোমনাথের মূর্তিটি দেখলেন, তখন তিনি মূর্তিটির উপরাংশ কুঠারাঘাতে ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দিলেন এবং আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত করালেন। মন্দিরের বিপুল ধনরাশি বের করে নিলেন। যার মূল্য ২,২০,০০,০০ দিনার। মন্দিরটি পুড়িয়ে ধূলিস্যাৎ করা হল।

হাবিব তাঁর বই "সুলতান অব্ গজনী"-তে বর্ণনা করেছেন,

Scanned by CamScanner

ব্রাহ্মণেরা মামুদকে প্রচুর ধনসম্পদ দানের প্রস্তাব করেন, যাতে তিনি মন্দিরটি ধ্বংস না করেন। কিন্তু মামুদ তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, মামুদ মূর্তিধ্বংসকারী, বিক্রেতা নয়।

যে ভাবেই হোক এই মন্দিরটিকে আর ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান সম্ভব হয়নি। এত বিপুল পরিমান অর্থ লুন্ঠিত হয়েছিল এবং যে ভাবে এটিকে অগ্নি সংযোগ করে ধূলিসাৎ করা হয়েছিল, তা হিন্দুরা বিশেষভাবে ব্রাহ্মণেরা আজও ভুলতে পারে নি, আর এই অবাধ ও চরম লুন্ঠনের জন্য মামুদ ইতিহাসের পাতায় নায়ক (hero) রূপে পরিচিতি লাভ করেন।

অ্যান্ আড্ভ্যান্সড্ হিস্টোরি অব ইন্ডিয়াতে (ব্রিটেন বাই থ্রি ডর্ক্স) উল্লেখ আছে, শুধু নাগারকোট থেকে মামুদ ৭,০০,০০ স্বর্ণ দিনার, ১০০ মণ সোনা ও রূপোর প্লেট, ২০০ মন বিশুদ্ধ স্বর্ণপিণ্ড, ২০০০ মন কাঁচা রূপো এবং মণি, মুক্তা, প্রবাল, হীরা ও রুবি ইত্যাদি মিলিয়ে ২০ মণ রত্ন লুঠ করেন।

হিন্দুরা জাতি বৈষম্যের কারণে এত বহুধা বিভক্ত ছিল এবং একের প্রতি একের ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল যে তাঁরা মিলিতভাবে একটি বিদেশীর এই আক্রমণকে প্রতিহত করা তো দূরের কথা, বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের প্রাণ যায়, তাদের নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়। মামুদ অবাধ লুন্ঠন লুঠতরাজ অতি সহজে সম্পন্ন করে বিনা বাধায় দেশে ফিরে যান।

সুলতান মামুদের আক্রমনের পর থেকে ভারতবর্ষে ইসলামধর্মের প্রচার সুরু হয়। স্যার টি আর্নোল্ডের মতবাদ, অস্ত্রের দ্বারা ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছে এরূপ বক্তব্য ঠিক নয়, মুখ্যত ধর্মপ্রচারকদের অবাধ বিরামহীন প্রচার ও প্রচেষ্টা এবং বণিক ও সওদাগরদের পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যাতায়াত ও যোগাযোগের মাধ্যমে ঐসলামীয় মতবাদ প্রসার লাভ করে। সিদ্ধা রাজার (১০৯৪-১১৯২) শাসনকালে নুরুদ্দিন গুজরাটে আসেন এবং তিনি কোরি, কুনবি এবং কারওয়ারদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করনে। এরপর বোখারার সৈয়দ জালালুদ্দিন এবং আজমিরের বিখ্যাত শেখ মৈনুদ্দিন্ চিস্তি ভারতে ধর্ম প্রচার করেন।

Scanned by CamScanner

তাছাড়া সূফি সাধু সন্তরা তাদের দয়া, করুণা ও অধ্যাত্মবাদের মাধ্যমে বহু ভারতীয়দের আকৃষ্ট করেন ও ইসলাম ধর্মে অন্তরিত করেন, বিশ্বজনীন ঈশ্বরতত্ত্ব, গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ঈশ্বর এই সূফী মতবাদ (Pantheism) ভারতীয় হিন্দুদের মনে প্রভাব বিস্তার করে এবং বহু অনুগামীর আগমন ঘটে, এদের মধ্যে চিস্তির অনুগামীর সংখ্যা ছিল বেশী। পাক পাঠানের ফরিদুদ্দিন শাকারগণের, দিল্লীর নিজামুদ্দিন আউলিয়া ও নাসিরুদ্দিন চিরাঘ এবং সিকারির শেখ সালিম চিস্তি প্রভৃতি সুফি সন্তগণ দেশ ও সমাজের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন।

মুসলিম কৃষ্টির সরলতা, অনাড়ম্বর ধর্মানুষ্ঠান, ইসলামের প্রতি অনুরাগীদের উপর অহেতুক চাপ প্রয়োগ না করা ইত্যাদি এই ধর্মের সাফল্যের অন্যতম কারণ।

ধর্মপ্রবর্তক হজরত মহম্মদ (৫৭০—৪জুন, ৬৩২) মুসলমানদের জন্য ৫টি অবশ্য করণীয় কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেন—যথা, 'কালিমা' অর্থাৎ একেশ্বরবাদ এবং মহম্মদের ধর্মমতে বিশ্বাস, 'নামাজ' অর্থাৎ আরবিতে দিনে পাঁচবার সমবেত প্রার্থনা—ভোরে, দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায়, এবং রাত্রির প্রথমভাগে সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে, শুক্রবারের দুপুরের নামাজ সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মুসলমানদের জন্য কোন মসজিদে সমবেতভাবে অবশ্য পালনীয় এবং সে ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০ জন অনুগামীর সমাবেশ আবশ্যিক, 'জাকাত' বা 'সাদকাহ' (Sadqah) অর্থাৎ সম্পত্তিকরের অংশ দান-খয়রাত কর যা থেকে গরীবদুঃখী, অসুস্থ ও জেহাদির সাহায্য দান করা হয়। 'রমজান' পালন—ঐ মাসে ভোর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত অনশনে থাকা একটি পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য এবং 'হজ' অর্থাৎ মক্কায় তীর্থযাত্রা। কোরাণে বিশেষ ক্ষেত্রে 'রমজান' পালন ও 'হজযাত্রায়' রেহাই বা মুক্তির বিধান আছে। মহম্মদ বরাবর পুতুল পুজকে ঘৃণা করতেন এবং কাবায় পুতুল পূজাকে কুপ্রথা বলে গণ্য করেন।

অন্যান্য ধর্মের মত ইসলাম ধর্মেও অনেক ভাগ আছে। তবে মূলতঃ সিয়া ও সুন্নি দু'ভাগে বিভক্ত। সুন্নিরা মুসলিম জনগণের ৭৫ শতাংশ। হজরত মহম্মদ কোন উত্তরসূরী (খলিফা) ঠিক করে যান নি।

Scanned by CamScanner

সিয়া ও সুন্নির মধ্যে মূল পার্থক্য হল খলিফা নির্ধারণ নিয়ে। সুন্নিরা প্রথম তিনজন খলিফাকে মহম্মদের উত্তরসূরী গণ্য করত। সিয়াগন তাঁদেরকে জবরদখলদার গণ্য করত এবং একমাত্র 'আলিকে' বৈধ খলিফা হিসাবে গণ্য করত। তারা বারোজন ইমামের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে, যার শেষ ইমাম এখনও আবির্ভাব হতে দেরি আছে।

'আলি' হল মহম্মদের খুড়তুতো ভ্রাতা। মহম্মদের কাকা আবু তালিবের পুত্র। আবু তালিব পিতামাতা হারা মহম্মদকে লালন পালন করেন। ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদের জন্মের কয়েক মাস আগে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর ছয় বছর বয়স কালে মাতার মৃত্যু ঘটে। বণিক আবু তালিবের দেশ বিদেশের বাণিজ্য পরিচালনা করতে করতে মহম্মদ খাদিজা নাম্নী এক ধনী বিধবা মহিলার সঙ্গে প্রণয়সূত্রে বিবাহ করেন। মহম্মদের তখন ২৫ বছর বয়স আর খাদিজার ৪০বছর অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী খাদিজা তাঁর চেয়ে ১৫ বছরের বড়। তাঁদের অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে ফতিমার সাথে তাঁর কাকার ছেলে অর্থাৎ খুড়তুত ভাই আলির বিবাহ হয়। সিয়ারা এই আলিকেই খলিফা গণ্য করত। এই হল সিয়া ও সুন্নীর মূল তফাৎ।

মহম্মদের অবশ্য পালনীয় ৫টি ধর্মীয় অনুশাসন—মুসলমানদের এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, একত্রে নামাজ পাঠ, একত্রে দান-খয়রাতি কর প্রদান, সমবেতভাবে রমজান পালন এবং প্রতিবছর বিশাল সমাবেশে হজ যাত্রা সম্মেলন তাদেরকে এক সূত্রে এক ঐক্যে বেঁধে রাখতে সমর্থ হয়েছে। একটি অটুট সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। ৬৩২ খ্রীস্টাব্দের ৪ই জুন মহম্মদ তাঁর অপর সুন্দরী ও তরুণী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণদের জাতিগত ঔদ্ধত্য, অনাচার, ব্যভিচার ও অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দু সমাজের নিপীড়িত—দলিত জনগণ মুক্তি ও আশার আলো দেখতে পেল। ফল স্বরূপ মুসলমান ধর্ম ভারতের বুকে বিরাট সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হল। হিন্দুদের ধর্মীয় অনৈক্য, জন্মভিত্তিক জাতি বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা ও স্পর্শজনিত দূষণ, বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত (different Scales), পর্যায়ভুক্ত অসাম্য (graded ineuality),

Scanned by CamScanner

একে অপরের প্রতি অশ্রদ্ধা, ভ্রাতৃত্ববোধ হীনতা এবং ঘৃণ্য বৈষম্য জাতির অন্তরসত্তাকে ভেঙে চুরমার করে ইসলাম ধর্ম শুধু এগিয়ে চলল না, রাজ ক্ষমতা হিন্দুদের কাছ থেকে কেড়ে নিল এবং সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সঙ্গতি সাধনে বাধ্য হয়ে মুসলমান সম্রাট ও তাদের শাসনাধীন হয়ে শাসককুলের কাছে আনুকুল্য ও আনুগত্যের প্রত্যাশি হয়ে পড়ল। সেক্ষেত্রে শাসককুলকে খুশী করতে অনেক হিন্দু সেইসব অভিমানী রাজারা তাদের ঘরের নারীদের অম্লান বদনে তাদের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করেনি।

হিন্দু সমাজের এই ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব হিন্দু সমাজ, ও জাতিকে ধ্বংস করে। আজও তা সমানে চলেছে। সংবিধানে Justice (ন্যায় বিচার), Liberty (স্বাধীনতা) ও Equality (সাম্য)-এর সঙ্গে Fraternity (ভ্রাতৃত্ব)-এর বিষয়টি যোগ করার অর্থই হল মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে না উঠলে স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা অর্থহীন হয়ে পড়বে। তাই আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ মূল্যবান, জাতিবিদ্বেষ ভুলে একে অপরের ভাই, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভাই এই সম্পর্ক থেকেই অস্পৃশ্যতার বিষ ধ্বংস হয়ে এক জাতি ও এক প্রাণের সঞ্চার ও সৃষ্টি হতে পারে, ঐক্য তৈরি হতে পারে। জাতি সুদৃঢ় হতে পারে। সাম্য ও স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই সব কথা ভেবেই ডক্টর বি আর আম্বেদকর সংবিধানে 'ভ্রাতৃত্ব' শব্দটি সংযোজিত করেন এবং পরবর্তী কালে 'হিন্দু কোড্ বিল' আনয়ন করেন। ওই সেই একই কারণে, ঐক্যমত্যের অভাবে তখনি গৃহীত না হলেও এখন তা ধীরে ধীরে গ্রহণ করা হচ্ছে।

মহম্মদের প্রচারিত এই অনুশাসনের ফলে মানুষে মানুষে সাম্যের আদর্শ বিভিন্ন ধরনের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। নামাজ অনুষ্ঠান, রমজানে, হজে, ঈদে সমস্ত মানুষ সে রাজা হোক বা ক্ষুদ্র ব্যক্তি হোক বাদশাহ বা গোলাম হোক, এবং বেগম বা বাঁদি হোক সবই এক ও সমান, কোন উঁচুনীচু ভেদাভেদ হীন, তা তাদের এক ঐক্যে এক সুরে বেঁধে রেখেছে। এইসব যদিও অন্যতম কারণ, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাব, চাওয়া-পাওয়া, ক্ষমতালিপ্সা, অর্থলাভ প্রতিপত্তি ও

Scanned by CamScanner

উন্নতিসাধনের প্রত্যাশাও ইসলাম ধর্মে অন্তরিত হওয়ার আকর্ষণ জুগিয়েছে। যখন মুসলিম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন রাজ আনুকুল্যের প্রত্যাশায় পুরাণ ধর্ম বিশ্বাস ও অনুশীলনী ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগল, হিন্দু সমাজে যা জাতিভেদের কারণে অসম্ভব। ইসলাম ধর্মে রাজকুমার এবং একজন ঝাড়ুদার বা মেথর তাঁদের পদমর্যাদা বা সম্পদের ভেদাভেদ ব্যতিরেকেই একত্রে পাশাপাশি বসে প্রার্থনা সমাপন করতে পারে। ভারতে ইসলাম ধর্মে এই অসামান্য শক্তিশালি আকর্ষণ একটি তীব্র ভ্রাতৃত্ববন্ধন, যা ঐ ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে সাম্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সে কারনে স্যার টি. অ্যারনোল্ড, যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ করেন যে শ্রেণী কুসংস্কারের অনুপস্থিতি ভারতে ইসলাম ধর্মে প্রকৃত শক্তির উৎস এবং এই কারণেই ইসলাম ধর্ম বহু হিন্দু জনগণের মন জয় করতে সমর্থ হয় ও বহু ভারতীয় হিন্দুত্ব পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ইসলাম ধর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষ অন্ততঃ এগারটি বিষয়ে উপকৃত হয় বলে উল্লেখ করেন। বৈদেশিক বাণিজ্য, বর্হিবিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ, নৌবানিজ্য, সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য, অভ্যন্তরীন শান্তি স্থাপন, প্রশাসনিক ও সামাজিক সমরূপতা, শিল্পকলা, ভাষা ও উন্নতযুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়। চোল সাম্রাজ্যের পতনের পর সামুদ্রিক বা নৌবাণিজ্য লুপ্ত হয়েছিল এবং ইসলামের অভ্যুত্থানে তা পুণঃরায় প্রতিষ্ঠিত হল।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৈমুরলঙ্গ, চেঙ্গিস খাঁ ও রিজিয়া সুলতানা

১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সমরখন্দ থেকে ৫০ মাইল দূরে ট্রান্সোক্সিয়ার (বর্তমানে উজবেকিস্থান) কেশে ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে অভিজাত তুর্কি উপজাতি বারলাসের প্রধান আমির তুর্ঘির পুত্র তৈমুরের জন্ম হয়। ভারতে নৈরাজ্য, বিশ্বাসঘাতকতা, হিন্দুদের বহুদেবতা এবং পুতুল পূজা ইত্যাদি অনাচার রোধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভারত অভিযানে আসেন। ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে ২৪শে সেপ্টেম্বর সিন্ধু নদী পেরিয়ে একের পর এক ধ্বংসলীলা চালিয়ে যান। ভাটনির দূর্গ ভেঙে ধূলিসাৎ করেন, হাজার হাজার নরনারী হত্যা করেন। সিরসুতি, কৈখাল ও সামনা লুঠ, ধ্বংস ও হত্যা করেন। সিরসুতি, কৈখাল ও সামানা লুঠ, ধ্বংস ও হত্যালীলা সম্পন্ন করে দিল্লী আক্রমন করেন। বহু লোক পালিয়ে জীবন বাঁচান। এই সময় তৈমুর যুদ্ধশিবিরে অবস্থিত ১০০,০০০ (এক লক্ষ) হিন্দুকে—যার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ— নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এমন কি ধার্মিক মৌলনা নাসিরুদ্দিন ওমর, যিনি জীবনে একটা চড়াইপাখি মারেন নি, তিনিও ঘটনাক্রমে তাঁর অধীন ১৫ জন হিন্দুকে বধ করেন। দিল্লী দখল করে দূর্গ প্রাচীরে বিজয়পতাকা উত্তোলন করেন। জাফরনামাতে সবিশেষে উল্লেখ আছে শত সহস্র নরনারীকে দাসদাসী বানান, গোটা দেশটাকে পদানত করেন। খিজির খানকে বিজিত রাজ্যগুলির (লাহোর, মূলতান এবং দিপালপুর) ভার দিয়ে তৈমুর ভারত ত্যাগ করে সমরখন্দে চলে যান, তৈমুজিন বা চেঙ্গিস খাঁ যেমন সমরখন্দ ও হিরাট দখল করে আগুন জ্বালিয়ে সভ্যতার ও সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে চিঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরের মত নৃশংস মানববিধ্বংসী মানুষ আর জন্মগ্রহণ করেন নি। ভারতবর্ষের গ্রীষ্ম কালীন অসহ্য গরম আবহাওয়ার ভয়ে মোঙ্গলরা সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিকে অভিযানে যাওয়ায় ভারতবর্ষ চেঙ্গিজ খাঁর

Scanned by CamScanner

ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পায়। ১২২৭ খ্রীস্টাব্দে চিন আক্রমন কালে চেঙ্গিজ মৃত্যুমুখে পতিত হন। চীনের জি জিয়া অধীনতা মেনে নেন। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায়নি। তাঁর সমাধিস্থলের হদিসও মেলেনি।

মিশর ও বাইজানটাইনের সম্রাটগণ বশ্যতা স্বীকার করলে তৈমুর সমরখন্দে ফিরে এসে চীন অভিযানে যাত্রা করেন, কিন্তু চিমকেন্টের (বর্তমানে কাজাখস্তান) পশ্চিমে সিরদরিয়া নদীর কাছে ওত্রারে অসুস্থ হয়ে ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মরদেহ সংরক্ষিত করে আবলুশ কাঠের কফিনে মুড়ে রাজধানী সমরখন্দে এনে গুর-ই আমির নামে সুসজ্জিত টম্বে সমাধিস্থ করা হয়।

সুলতান ইলতুতমিসের পুত্রগণ অযোগ্য, অলস ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ায় তিনি তাঁর বিদুষী কন্যা রিজিয়াকে সিংহাসনে বসাতে চান। আমীর, ওমরাহরা নারীর শাসন মানতে চান নি। ইলতুতমিসের এক কুখ্যাত লম্পট ছেলে রুকনুদ্দিনকে সিংহাসনে বসান। তাঁর মাতা শাহ্ তুরকান্ অন্তরাল থেকে শাসন পরিচালনা করতেন। কিন্তু মাতা ও পুত্র মেলে তাঁদের এক ভাই কুতুবদ্দিনের হত্যা সংঘটিত করলে রাজন্যবর্গ ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। তার উপর রাজমাতা রিজিয়াকে মারার ষড়যন্ত্র করলে, দু'জনকে মত্ত জনতা কারারুদ্ধ করেন। ১২৩৬ খ্রীস্টাব্দে রুকনুদ্দিন কারাগারে মারা যান।

এমতাবস্থায় রিজিয়ার সিংহাসন অরোহনকে আমীর ওমরাহ ও অভিজাতরা মেনে নেন। সামান্য কিছু বিরোধীদের তিনি দমন করেন।

রিজিয়া মধ্যযুগের প্রথম বিদুষী প্রতিভাবান নারী, যার মধ্যে রাজকীয় যাবতীয় গুণের সমন্বয় ছিল এবং যে যুগে নারীর শাসন মান্য করা হত না সেই যুগে তিনি নারীর পোষাক বর্জন করে, জেনানা পরিত্যাগ করে, পুরুষ-পোষাকে সজ্জিত হয়ে খোলা রাজ দরবারে দক্ষতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। হিন্দু এবং মুসলিম বিদ্রোহী শাসকদের বিরুদ্ধে নিজে যুদ্ধযাত্রা করতেন এবং লাহোরের শাসককে পরাজিত করে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। কিন্তু সেই একই দুর্বলতা অর্থাৎ যৌন দুর্বলতা তাঁকে সবচেয়ে অযোগ্য শাসকে পরিণত করল। ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন তাঁর এই একামাত্র দুর্বলতাকে তাঁর

Scanned by CamScanner

সাফল্যের অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করেন। একজন আবিসিনিয় ক্রীতদাস জামালুদ্দিন ইয়াকুত তাঁর অধীনে অশ্ব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল। রিজিয়া তাঁর প্রতি ক্রমে ক্রমে এতই যৌনাসক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েন যে তিনি তাঁকে মাত্রাতিরিক্ত অনুগ্রহ ও আনুকূল্য দান করতেন, যা তাঁর ব্যক্তিত্বকে অনেক নিম্নপর্যায়ে নিয়ে যায়। তুর্কি মামলুকগুলির সেনাদলগুলি যা 'চল্লিশা' বলে পরিচিত ছিল তারা মুক্ত খানদের ক্ষমতা খর্ব করে; সেইখানেরাও রিজিয়ার এই আবিসিনিয়ান ক্রীতদাসের প্রতি অনুরক্ততাকে মেনে নেন নি। তাঁর উপরে যখন তিনি সরাসরি জনসমক্ষে হাজির হওয়া সুরু করলেন, তাতে গোঁড়া মুসলমানরা ক্ষোভে ফেটে পড়ল। সরহিন্দের এক বিদ্রোহী শাসক আলতুনিয়া রিজিয়ার অধীনতা অস্বীকার করার রিজিয়া রাজধানী থেকে বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হয়ে তারারহিন্দে উপনীত হলে তুর্কিরা রিজিয়ার প্রণয়ী প্রাণপ্রিয় আবেসিনিয় ক্রীতদাস জামালুদ্দিন ইয়াকুতকে হত্যা করে এবং রিজিয়াকে দুর্গমধ্যে কারারুদ্ধ করে। চতুর রিজিয়া নানা ছলে আলতুনিয়াকে প্রেম নিবেদনের ইঙ্গিত দিলে আলতুনিয়া সুন্দরী বিদুষী রিজিয়ার প্রতি এতই আসক্ত হয়ে পড়েন যে যোগাযোগ সম্পন্ন করে দ্রুত রিজিয়াকে বিবাহ করে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হন। দু'জনে মিলে দিল্লী পুণরুদ্ধার করতে যাত্রা শুরু করলেন। রিজিয়ার এক ভাই মইজুদ্দিন বাহরাম শাহ রাজন্যবর্গের সহযোগিতায় দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং মইজুদ্দিনই ওঁদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করে যুদ্ধে পরাস্ত করলে আলতুনিয়ার সেনাবাহিনী আলতুনিয়াকে পরিত্যাগ করে চলে যান। আলতুনিয়া ও রিজিয়া হিন্দুদের হাতে ধরা পড়লে, তাঁরা দু'জনকে হত্যা করেন (১২৪০ খ্রিস্টাব্দে)। ফলে রিজিয়া মাত্র সাড়ে তিন বছর রাজত্ব করবার সুযোগ পান। রিজিয়ার ভ্রাতা মইনুদ্দিন নির্ভিক, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং অসীম সাহসী। তিনি কঠোর হস্তে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ প্রভৃতি দমন করেন। এমত সময় মোঙ্গলরা ১২৪১ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুস্থানে অভিযানে এসে লাহোর দখল করে। কিছুদিন পরে সুলতান মইজুদ্দিনকে গুপ্তহত্যা করা হয়। ইলতুতমিসের পৌত্র আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ সিংহাসনে আরোহন করেন। ১২৪৫ খ্রীস্টাব্দে মোঙ্গলরা আবার ভারত আক্রমণ করলে

Scanned by CamScanner

মোঙ্গলরা শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে বিতাড়িত হয়। কিছুকাল পরেই এই সুলতানও চরম ইন্দ্রিয়লালসায় নিমজ্জিত হলেন এবং চরম অত্যাচারীতে পরিণত হলেন। আমীরদের মদতে মাসুদ শাহকে ১২৪৬ খ্রীস্টাব্দে কারাগারে বন্দী করার কিছুকাল পরেই মাসুদ মারা যান। ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ সিংহাসনে বসেন। ইনি ছিলেন ধার্মিক। শিক্ষিত ব্যক্তি ও পণ্ডিতদের গুণগ্রাহী ও অনুরাগী, গরীব ও নিপিড়ীত শ্রেণীর প্রতি সমব্যাথী ও দয়াদ্রচিত্ত। ইনি রাজসুখ ও প্রাচুর্য্য পরিত্যাগ করে দরবেশের জীবন বেছে নেন এবং কোরানের পংক্তিগুলি নিজে গুছিয়ে লিখে বিক্রী করে নিজের জীবনধারন করতেন। এসময়েও মোঙ্গলরা ভারত আক্রমন করে; কিন্তু তার সুদক্ষ তুর্কি সেনাপতি বলবন কঠোর হস্তে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন, রাজকার্য ও বৈদেশিক উভয় নীতি ও কার্য পরিচালনা করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

আলাউদ্দিন খলজী, মালিক কাফুর, পদ্মিনী, কমলাদেবী, দেবলা দেবী

দাস বংশের পতনের পর খলজী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আলি গুরশাস্প্‌ ভারতের দক্ষিণাংশে হিন্দু রাজা ইলিচপুর ও দেবগিরি জয় করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে তার বিপুল সম্পদ লুণ্ঠন করে দিল্লী ফিরে আসেন। কাকা এবং শ্বশুর জালাল-উদ্দিনকে ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দে খুন করেন। আলাউদ্দিন খলজী নাম ধারন করে সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুরও একজন কুখ্যাত লুণ্ঠনকারী বলে চিহ্নিত। ১৩০৮ খ্রীস্টাব্দে কাফুর দক্ষিণে অভিযান সুরু করেন। রণথম্বর বরঙ্গল, কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে ইয়শল বংশ, মাদুরা, দেবগিরি, মাবার দখল, তছনছ ও লুণ্ঠন করে বিপুল সম্পদ নিয়ে ১৩১১ সালে দিল্লী ফেরেন। ঐতিহাসিক জিয়া বারানি লিখেছেন আলাউদ্দিন এত বিপুল ধনরাশি লুঠ ও অধিকার করেন, এত সেনা বাহিনী ও হস্তী তাঁর অধীনে ছিল তা গণনা করা দুঃসাধ্য এবং তিনি ধনমত্ত হয়ে নিজেকে হজরতের সমকক্ষ গণ্য করে নতুন ধর্ম প্রবর্তনে প্রবৃত্ত হন। হজরত মহম্মদের মতনই তাঁর চার প্রিয়বন্ধু সহচর উল্লুখ খাঁ, জাফরখান, নুসরত খান এবং আলপ খান রাজকীয় মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন তাঁর আনুকুল্যে এবং এই চার জনের সহযোগীতায় তিনি প্রোফেট্ মহম্মদের মতন নতুন ধর্ম প্রবর্তন করবেন। ঐতিহাসিক জিয়া বারানির ভাইপো কাজি আল্ উল্ মুল্ক-এর পরামর্শে বিরত হন, তাঁকে বোঝান চিঙ্গিস খাঁ রক্তগঙ্গা বহিয়ে দিয়েও মুঘল ধর্ম প্রচার করতে সমর্থ হননি, বরং মুঘলরা অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে আলাউদ্দিন রাজা হামিরকে পরাজিত ও নিহত করেন, কিন্তু হামিরের মুঘল সেনাপতি মির মহম্মদ শাহ চরম আহত হয়েও বশ্যতা স্বীকার করেন নি। আলাউদ্দিন ১৩০১ খ্রীস্টাব্দে রাজপুতনার রণথম্বর হামিরের কাছ থেকে দখল করে উলুঘ

খাঁকে শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন। রাজপুতনার মেবারের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। এখনকার চিতোরের দুর্গ ছিল পাহাড় পর্বতে ঘেরা দুর্গম বিপদ সংকুল এবং এত দুর্ভেদ্য যে এর আগে কোন মুসলিম শাসক অভিযান করার দুঃসাহস দেখান নি। আলাউদ্দিন শুধুমাত্র রানা রতন সিংহের অসামান্য রূপবতী রাজপত্নী এবং চিলোনপতি হামির শঙ্খের কন্যা, তামাম হিন্দুস্থানে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের জন্য খ্যাতনাম্নী পদ্মিনীর রূপকাহিনী শুনে এতই কামনা বাসনায় উদ্দীপ্ত ও মত্ত হয়ে পড়েন যে, যে কোন মূল্যে তিনি এই অসীম রূপ লাবণ্যময়ী পদ্মিনীকে করতলগত করবার সংকল্প করলেন এবং এই দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলে অভিযান শুরু করলেন। এই অভিযানের নেপথ্যে একটি কাহিনী লুক্কায়িত আছে। রানা রত্ন সিং-এর বীরত্বের কথা আলাউদ্দিনের কর্ণগোচর হয়। আলাউদ্দিন রতন সিংকে পরাভূত করবার একটি ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি প্রস্তাব দেন এই অলোকসামান্য রূপবতীকে তিনি শুধুমাত্র চোখে দেখতে পেলে খুশী হয়ে প্রত্যাবর্তন করবেন। রানা তাঁকে জানান রাজপুত রমনীরা ধর্মীয় সংস্কার অনুযায়ী বহিরাগত পুরুষদের সম্মুখে আসেন না। অতঃপর রানা বিবাদ নিষ্পত্তির কারণে সুবৃহৎ দর্পনের মধ্য দিয়ে রানীকে প্রদর্শন করবার সুযোগ করে দেন। মত্ত আলাউদ্দিন প্রস্তাব গ্রহণ করে রানীকে দর্পনের মধ্য দিয়ে অবলোকন করে অভিভূত হয়ে পড়েন। রানা পদ্মিনীকে দর্পনবিম্বে দেখানোর পড়ে সৌজন্যতা বশতঃ সুলতানকে চিতোর দুর্গের অভ্যন্তর ভাগ থেকে বর্হিভাগ পর্যন্ত প্রত্যুদ্গমন করে বিদায় শুভেচ্ছা জানাতে এগিয়ে যান এবং অকস্মাৎ পূর্বপরিকল্পনা মত তাঁর সৈন্যগণ দ্বারা তিনি রানা রতন সিংকে আটক করে নিজের যুদ্ধশিবিরে হাজির করে বন্দী করেন। কামান্ধ আলাউদ্দিন সংবাদ পাঠালেন, একমাত্র রানী পদ্মিনীর বিনিময়ে এবং পদ্মিনী যদি তাঁর হারেমে যেতে রাজি থাকেন তবেই তিনি রতন সিংকে মুক্তি প্রদান করবেন, অন্যথায় নয়। রানার জীবন সংশয়াপন্ন হল। রাজপুত জাতির জাতীয় সম্মানে এই অনপনেয় কলঙ্করাজি সহ্য করা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। তারা পরবর্তী করণীয় কার্য নিয়ে বিস্তর আলোচনা করলেন। শুধু নিজের নয় গোটা রাজপুত জাতির ও রাজপুত

Scanned by CamScanner

রমনীদের সম্মান রক্ষার্থে রানী পদ্মিনী রাজপুতদের পরিকল্পনা মত সুলতানের ইচ্ছাকে পূরণ করতে রাজি হওয়ার মত প্রকাশ করলেন। তিনি মুসলিম সৈন্যশিবিরে আলাউদ্দিনের কাছে যেতে সম্মত হলেন। কিন্তু কিছু শর্ত আরোপ করলেন, বিশেষভাবে তিনি যেহেতু রাজরানী তাই তাকে যথোপযুক্ত রাজকীয় সম্মানে ও মর্যাদায় কয়েক শত রাজসহচরীদের সমভিব্যাহারে শিবিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করতে হবে। কামাতুর আলাউদ্দিন কমবিভোরে মোহিত হয়ে দ্রুত রাজী হয়ে গেলেন। সাতশত শিবিকা সম্পূর্ণ আবৃত অবস্থায় পদ্মিনীর শিবিকাকে অনুসরণ করে চলতে লাগল শিবিকা বাহকদের দ্বারা। এর মধ্যেই ছিল সুসজ্জিত অস্ত্র সমুদয় সহ বীর সেনানীগণ এবং পদ্মিনীর দাবী মত কঠোর ও গভীর গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার মাধ্যমে সুলতানের শিবিরে সবাইকে উপনীত করা হলে শিবিকা থেকে বীর যোদ্ধাগণ অতর্কিতে নির্গত হয়ে তুমুল যুদ্ধ করে রানা রতন সিংকে উদ্ধার করে চিতোরে নিয়ে গেলেন। রাজপুত সৈন্যগণ রানীর সুকৌশলকে কাজে লাগিয়ে রতন সিংকে উদ্ধার করা সত্ত্বেও প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়েও তাঁরা পরাস্ত হলেন। চিতোর দুর্গের বর্হিদ্বার ভেঙে মাটিতে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। পালাবার পথ না পেয়ে রাজপুত রমনীরা তাদের জাতির প্রথামত ভয়ংকর জহরব্রত অবলম্বন করে দলে দলে অগ্নিশিখায় জীবন আহুতি দিলেন। ঐতিহাসিক আমীর খসরু সুলতানের সঙ্গী ছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট, সোমবার আলাউদ্দিন চিতোর দখল করেন, কিন্তু কামাতুর আলাউদ্দিন পদ্মিনীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। রাই রতন সিং পালিয়ে গেলেও পরে আত্ম সমর্পণ করেন। আমীর খসরু তাঁর বর্ণনায় বলেন, একদিন গোটা রাত্রিব্যাপী রাই পর্বতের চূড়া থেকে রমনীদের উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করেন। রমনীরা তা পুনরায় প্রজ্বলিত করে জহরব্রত পালন করেন। ঐতিহাসিক ফিরিস্তা ও হাজি-আদ্-জারিরের লেখা "আরাবীক হিস্টোরি অব গুজরাট' গ্রন্থে এ বিষয়ে বর্ণনা দেওয়া আছে। ত্রিশ হাজার হিন্দু জনগণকে নিহত করে তাঁর পুত্র খিজির খানকে চিতোরের শাসনভার দিয়ে আলাউদ্দিন দিল্লী ফিরে যান। আলাউদ্দিন

Scanned by CamScanner

তাঁর 'বাজারনীতি' (মার্কেট পলিসি) এবং ক্রমোচ্চ সেনাবাহিনী গঠনের জন্য বিখ্যাত হন। এত সত্ত্বেও অত্যাচারী সুলতানের পরিণতি ভাল হয় নি। তাঁর নিজের বিশ্বস্ত সেনাপতি মালিক কাফুর সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর অন্য সব পুত্রদের অন্ধ করে বা কারাবন্দী করে এক নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত অভিজাত সম্প্রদায় বা অন্য কোথা থেকেও বাধা পান নি। কিছুকাল পরে একজন হিন্দু ধর্মান্তরিত মুসলিম খসরু, রাজপ্রাসাদ রক্ষীদের হাতে মালিক কাফুর নিহত হলে, সিংহাসন দখল করেন। তিনি পরে ইসলাম বিরোধী ও সব রকমের অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত ছিলেন।

উত্তর ভারত জয়ের পর আলাউদ্দিন দাক্ষিণত্যের দিকে নজর দিলেন। মধ্যযুগে লুণ্ঠন, লুঠতরাজ, মন্দিরধ্বংস, নারী ধর্ষণ ও অত্যাচার এবং বলপূর্বক পানিগ্রহণ প্রভৃতি ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। এর কোন প্রতিকার ছিল না। আলাউদ্দিনের ধ্বংস, লুণ্ঠন ও লাম্পট্য আরোও প্রকট হল দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সময়। ইনিও সোমনাথ মন্দির, গজনীর মামুদ কর্তৃক ধ্বংসের পরে যা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, ধ্বংস করার জন্য অভিযানে মালিক কাফুরকে সেনাপতি করে সৈন্যবাহিনী নিয়ে যোগ দেন। তাঁরা একযোগে বাঘেলার শেষ হিন্দু নৃপতি রাই করণকে আক্রমন করলে রাই যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে তাঁর রাজধানী নহরবালা থেকে পলায়ন করে মহারাষ্ট্রের দেবগিরির (দৌলাতাবাদ) রাজা রাম দেও (রামচন্দ্র যাদব)-এর কাছে তাঁর দুই কন্যাসহ আশ্রয় নিলেন। এই সুযোগে মালিক কাফুর বাঘেলা আক্রমণ করে লুঠ ও ধ্বংস করে রাই করনের পরমা সুন্দরী স্ত্রী কমলা দেবীকে জোরপূর্বক হরণ করে আলাউদ্দিনের সামনে হাজির করলে তাঁর রূপ লাবন্য দেখে লাম্পট্য উন্মাদনায় অস্থির হয়ে উঠে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে রাজ অন্তঃপুরে নিয়ে যান। তাঁকে অবিলম্বে বিয়ে করে অঙ্কশায়ী হন। বিভোর আলাউদ্দিনের কাছে তখন রানীমাতার ইচ্ছাই তাঁর আদেশ। রানীমাতা কমলাদেবীর বড় মেয়ে রাম দেও-এর আশ্রয়ে থাকাকালীন মারা যান। ছোট মেয়ে দেবল্‌দেবীর বয়স তখন মাত্র চার। বিকৃত যৌনরুচির আলাউদ্দিন একজন বিবাহিতা হিন্দুনারীকে সম্ভোগে মত্ত। কমলাদেবী এই সুযোগে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা

Scanned by CamScanner

দেবল্‌দেবীকে কাছে পেতে চাইলে আলাউদ্দিন অবিলম্বে মালিক কাফুরকে যে করে হোক দেবলদেবীকে দিল্লির রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন।

ইতিমধ্যে রাজা রাম দেও-এর সাহায্য নিয়ে রাই করণ গুজরাটের বাঘলানা পুনর্দখল করলেন। মালিক কাফুর এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া কঠিন বুঝতে পেরে আলাউদ্দিনকে জানালে তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ খানকে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এই মিলিত বাহিনীকে রাই করণ দু'মাস কাল অবধি আটকাতে পারলেন।

এদিকে দেবল্‌দেবীর বয়স বেড়ে তের বছর হয়েছে। দেবগিরির রাজা রাম দেও-এর বড় ছেলে শংকর দেও দেবল্‌দেবীর রূপ মাধুর্যে এতই বিমোহিত হন যে তাঁকে ভালবেসে তাঁর ভাই ভীমদেও রাই করণের কাছে দেবল্‌দেবীকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠান। ইতিমধ্যে কাফুরের সেনাবাহিনী হতাশায় প্রত্যাবর্তন করেন। রাই করণ কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহের প্রস্তাব পাওয়ার পর শংকরদেও জাতিতে রাজপুত না হওয়ায় প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর অসহায়তার কথা ভেবে প্রস্তাবে রাজি হয়ে দেবল্ দেবীকে ভীম রাও-এর সঙ্গে শংকর দেও-এর বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য পাঠান। এই সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে দেবলদেবীকে দিল্লীর প্রাসাদে হাজির করার নির্দেশ প্রাপ্ত আলাপ খান সসৈন্যে দেবল্ দেবীর অভিগমন আটকাবার জন্য রওনা দিলেন। বাঘেলার চারিদিক দিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমন শুরু করল এবং রাই করণকে এবার পরাস্ত করলে রাই করণ দেবগিরি অভিমুখে পলায়নের জন্য যাত্রা করলেন। এসময় আলাপ খান দেবগিরি পর্বতমালার কাছে ও অনতিদূরে ইলোরা গুহার কাছে সৈন্য সমভিব্যাহারে এগিয়ে যেতে থাকল। এখানে মারাঠা সেনাবাহিনীর কাছে ভীম দেও আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং দেবগিরিতে ভাইয়ের কাছে সংবাদ পাঠান, তিনি দেবল্‌দেবীকে শংকর দেও-এর সঙ্গে বিবাহের নিমিত্ত দেবগিরিতে নিয়ে যাচ্ছেন। দেবগিরিতে তাঁর দাদা শংকর দেও-এর সঙ্গে দেবল্‌দেবীর বিবাহের সুচারুভাবে সম্পন্ন হওয়ার আয়োজন চলছিল। সেই সময় পথিমধ্যে ভীম দেও আলাপ খানের

Scanned by CamScanner

সেনাবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হলেন এবং যুদ্ধে পরাস্ত করে আলাপ খান দেবলদেবীকে অবরুদ্ধ করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লির প্রাসাদে আলাউদ্দিনের অধুনা স্ত্রী কমলাদেবীর সম্মুখে হাজির করলে সুলতান উল্লাসে ফেটে পড়েন।

আলাউদ্দিনের বড় ছেলে খিজির খানকে চিতোরের শাসনভার দিয়েছিলেন এবং চিতোরের নাম খিজিরাবাদ রাখেন। খিজির খানকে দিল্লীর প্রাসাদে উপনীত হয়ে অলোকসুন্দরী পরমা দেবল্‌দেবীকে দেখে বিচলিত হন। দিল্লীতে থাকাকালীন সময়ের মধ্যে খিজির ও দেবল্‌দেবীর মধ্যে আন্তরিক প্রণয় গড়ে ওঠে। খিজির বিবাহের প্রস্তাব দিলে আলাউদ্দিন রাজী হলেও খিজিরের মাতা (আলাউদ্দিনের আর এক স্ত্রী) মালিক জাহান ঘোরতর আপত্তি তোলেন। কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর ভাই আলপ খানের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বড় ছেলে খিজিরকে বিবাহ দেবেন। তাঁর অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও খিজির আর দেবল্‌দেবীকে কিছুতেই আলাদা না করতে পেরে ব্যর্থ হয়ে দেবলদেবীকে সিরির ফোর্টের লাল রাজপ্রসাদে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু গোপনে খিজির তাঁর এক প্রস্থ কেশগুচ্ছ দেবল্‌দেবীকে প্রদান করেন। বিনিময়ে দেবল্‌দেবী তাঁর হাতের আংটি উপহার দিয়ে সিরির ফোর্টে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর মাতা মালিক জাহান কিছুতেই খিজিরের মনের পরিবর্তন সাধন করতে পারলেন না। খিজির কোন অবস্থাতেই দেবল্‌দেবীকে ছাড়া অন্য কাহাকে বিবাহে আদৌ সম্মত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত রানীমাতা খিজিরকে দেবল্‌দেবীর সাথে বিবাহে সম্মতি দিতে বাধ্য হলেন। মহা সমারোহে দিল্লীর রাজপ্রাসাদে খিজির খান ও দেবল্‌দেবীর বিবাহ হল। তাঁর মা কমলাদেবীকে জোর পূর্বক বিবাহ করলেন আলাউদ্দিন আর তাঁকে অর্থাৎ কমলাদেবীর কন্যা দেবল্‌দেবীকে বিবাহ করলেন আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খান। পিতা ও পুত্র যথাক্রমে মা ও তাঁর মেয়েকে বিবাহ করলেন।

কাফুর বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করে অপরিমিত ধনসম্পদ সহ আরো সুন্দরী রমনীদের অবরুদ্ধ করে এনে তাঁর প্রভুকে উপহার দিতেন। আলাউদ্দিন তাঁর হারামের নিত্য নতুন রমনীকে নিয়ে অঙ্কশায়ী হয়ে

Scanned by CamScanner

খুশির জোয়ারে ভেসে বুঁদ হয়ে থাকতেন। একদিনের সুঠাম সুন্দর ক্রীতদাস কাফুর আলাউদ্দিনের সেনাপতি 'মালিক নেইল্ কাফুর হাজার দিনারী' উপাধিতে ভূষিত হলেন।

মালিক কাফুর অধুনা তেলেঙ্গানার প্রাচীন রাজধানী বরঙ্গলের রাজা প্রতাপ রুদ্র দেব কাকতীয়কে আক্রমন করে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁর কাছে করুণা ভিক্ষা করলেও অদমনীয় কাফুর কোন কিছুতেই দয়াদ্র হন নি, বরং নির্দয় কাফুর তাঁর কাছ থেকে রাজকোষের সমুদয় সম্পদের দখল চাইলেন। বিনিময়ে তবেই তিনি নির্বিচারে ব্রাহ্মণ হত্যা রহিত করবেন। অন্যথায় বরঙ্গলকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করবেন। প্রতাপ রুদ্র দেব অগত্যা তাতে রাজী হলেন। এক হাজার উটের পিঠে বিপুল সম্পদ রাশি বহন করতে গেলে উটগুলি চরম কষ্টে আর্তনাদ করতে করতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে ১৩৩০ খ্রিস্টাব্দের মার্চে দিল্লীতে উপনীত হল। একইভাবে মাবার (কুলাম থেকে নেলর) দখল নিলেন। শংকর দেব দেবল্ দেবীকে বিবাহ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে বিফল হন। তিনি তাঁর পিতা দেবগিরির রাজা রামদেওর মৃত্যুর পর সুলতানকে বাৎসরিক রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেন। আলাউদ্দিনের নির্দেশে কাফুর ১৩১২ খ্রীস্টাব্দে গোটা মহারাষ্ট্র ধ্বংস করেন এবং শংকর দেও-এর মস্তক ছেদন করে সুলতান কে সংবাদ পাঠান। তারপর চোল, চেরা, পাণ্ড্য, হয়শাল, কাকতীয় এবং যাদব বংশের রাজাদের সম্পূর্ণ উৎখাত করেন। গোটা দাক্ষিণাত্য কাফুরের তথা আলাউদ্দিনের পদতলে নিক্ষিপ্ত হল। হিন্দু রাজা ও ব্রাহ্মণদের জাতীয় ঔদ্ধত্য, ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও তদ্দজনিত অনৈক্যের জন্য আরো একবার হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গ মুসলমান শাসকের কাছে পরাস্ত ও পদানত হল। ভারতের গৌরব বা স্বাধীনতা ধূলায় মলিন হল।

Scanned by CamScanner

চতুর্থ অধ্যায়

রাজা পৃথ্বীরাজ, রাজা জয়চন্দ্র ও সংযুক্তা

পৃথ্বীরাজ পিতা সোমেশ্বর ও মাতামহ অনঙ্গপাল-এর মৃত্যুর পর যথাক্রমে আজমের ও দিল্লীর অধীশ্বর হন। কনৌজের রাঠোর রাজা জয়চন্দ্র অনঙ্গপালের অপর দুহিতার পুত্র। অপুত্রক অনঙ্গপাল দিল্লীর সিংহাসন পৃথ্বীকে অর্পণ করায় জয়চন্দ্র পৃথ্বীকে শত্রু গণ্য করতে শুরু করেন। পৃথ্বীরাজকে অপমান করার অভিপ্রায়ে জয়চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ এবং একই সঙ্গে স্বীয়কন্যা সংযুক্তার বিবাহের জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেন। এই যজ্ঞে অধীনস্থ সামন্ত রাজাদের ভৃত্যোচিত কার্যে নিযুক্ত করা হয়। পৃথ্বীরাজকে দ্বারী হবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। পৃথ্বীরাজ অপমান বোধ করে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেন। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের একটি প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়ে দ্বারদেশে দ্বাররূপে স্থাপন করালেন। কিন্তু সংযুক্তা যে পৃথ্বীরাজের অনুরাগিনী জয়চন্দ্র তা জানতেন না। সংযুক্তা সভামধ্যে পৃথ্বীরাজকে দেখতে না পেয়ে দ্বারদেশে পৃথ্বীর প্রতিমূর্তির গলায় বরমাল্য প্রদান করলেন। লুক্কায়িত থেকে গুপ্তস্থান থেকে সময়মত বেরিয়ে পৃথ্বীরাজ অশ্বপৃষ্ঠে হাজির হয়ে সংযুক্তাকে অশ্বপৃষ্ঠে নিজের পাশে স্থাপন করে জয়চন্দ্রের সেনাদের পিছনে ফেলে সপ্তম দিনে দিল্লীতে ফিরে গেলে, মহা সমারোহে দিল্লীতে উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এরপরে পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রের মধ্যে বিরোধ আরো চরম আকার ধারণ করল। ইত্যবসরে মহম্মদ ঘোরীকে গোপনে পৃথ্বীরাজকে আক্রমন করবার সুযোগ করে দিলেন। ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমন করলেন। জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায়, ১০৮ জন সামন্তরাজের মধ্যে মাত্র ৬৪ জন সাহায্যার্থে এগিয়ে এল, নিজে সম্পূর্ণ বিরত রইলেন। ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে তরাইনের প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় পৃথ্বীর বিশ্বস্ত সেনাপতি গোবিন্দ রাই এবং তাঁর ভাই ঘোরিকে কঠোর আঘাত হানলে কোন প্রকারে জীবনে বেঁচে এক খিলজী যোদ্ধার সাহায্যে সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পান ও তাঁর

Scanned by CamScanner

সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে বিভিন্নদিকে পলায়ন করে। এর আগে কখনই কোন সুলতান হিন্দুরাজের হাতে এমন পরাজয় স্বপ্নেও ভাবেন নি। অপমানে ঘোর-এ ফিরে গিয়ে পদস্থ সেনাধ্যক্ষদের যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পলায়ন করার জন্য প্রকাশ্যে অপমান করেন এবং প্রায় এক বছর যাবৎ ক্ষোভে, দুঃখে ও অপমানে তিনি ভালভাবে নিদ্রা যেতে পারেন নি। পরের বছর ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে গতবারের যুদ্ধের বিজয়োৎসব পালনের পর রাত্রিতে সেনাবাহিনী শিবিরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় জয়চাঁদের জনৈক চরের সহযোগীতায় তরাইনের কাগার নদীর তীরে রাতের অন্ধকারে ঘোরী প্রচুর সৈন্য নিয়ে হাজির হন এবং সুযোগ বুঝে অপর পারে পৃথ্বীরাজের সেনাবাহিনীদের উপর এত তীব্র আক্রমন করেন যে তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন নি। পরের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে, ইতিমধ্যে ১৫০ রাজপুত রাজা যুদ্ধে অংশ নেন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেও পৃথ্বীরাজের সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পৃথ্বীরাজ পালাতে গেলেও সিরসুতির (সরস্বতী নদীর তীরে প্রাচীন শহর) কাছে ধরা পড়েন। নির্মম অত্যাচার করা, এমনকি হাতির পিছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে বহুদূর টেনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং হত্যা করা হয়। রাজপুতদের কাছে এটি একটি অপূরণীয় ক্ষতি। হিন্দুদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা, বিদ্বেষ ও জাতিহিংসা আজও হিন্দুজাতিকে একই সৌভ্রাতৃত্ব ও একসূত্রে বাঁধতে পারে নি। বিখ্যাত হিন্দি কবি চাঁদ বরদাই-এর লেখা "পৃথ্বীরাজ রাসো"-এর প্রথম খণ্ডে এর বর্ণনা আছে। বইটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত।

Scanned by CamScanner

পঞ্চম অধ্যায়

বিজয়নগর রাজ্যের সামাজিক অবস্থা, মহিলাদের করুণ অবস্থা, মাহমুদ খলজী ও চিতোরের রাজা কুম্ভ

ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগে অবস্থিত বিজয়নগর রাজ্যের খ্যাতনাম ঐতিহাসিক সোয়েল তাঁর লেখা 'এ ফরগোটেন এম্পায়ার' গ্রন্থে (২০-২২ পৃষ্ঠা) বিজয়নগর রাজ্যের পরপর সাতটি ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রমানুগ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। ইটালিয় পর্যটক ১৪২০-২১ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরে অবস্থান করেন এবং তাঁর দেওয়া বিজয়নগর রাজ্যের সম্পর্কে অনেক সমৃদ্ধির বর্ণনা যেমন জানা যায় তেমনি সামাজিক অবস্থার বর্ণনা জানা যায়। রাজ্যের অধিবাসী বয়স্ক পুরুষেরা যত খুশী বিবাহ করত। স্বামী মারা গেলে ঐসব স্ত্রীদের স্বামীর চিতায় জোরপূর্বক পুড়িয়ে মারা হত। ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে বিজয়নগরের রাজা সবচেয়ে ক্ষমতাবান ছিলেন। তাঁর ছিল ১২০০০ স্ত্রী। তিনি কোথাও যাত্রা করলে ৪০০০ স্ত্রী সঙ্গী হত। সমসংখ্যক অর্থাৎ ৪০০০ স্ত্রী সুন্দর বেশভূষায় সুসজ্জিত অশ্বারোহন করে অনুসরণ করত। বাঁকি ৪০০০ স্ত্রীকে শিবিকায় বহন করা হত। যার মধ্যে ২০০০ থেকে ৩০০০ হাজার ছিল বিশেষ ভাবে নির্বাচিত যাঁরা স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে স্বামীর চিতায় সহমরণে যাবেন এবং যেটি নাকি তাদের পক্ষে একটি পরম পবিত্র ও সম্মানের কাজ—যা নারীদের প্রতি একটি বর্বর জঘন্য অত্যাচার। বছরের কোন এক সময়ে দেবমূর্তি নিয়ে শহরের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হত। যার মধ্যে শত শত যুবতী নারী সুসজ্জিত হয়ে থাকত যাঁরা সুর করে দেবতার প্রতি স্তোত্র গাইত। এই শোভাযাত্রায় প্রচুর জন সমাগম হত। ধর্মবিশ্বাসী অনেক লোকই দেবমূর্তি বাহিত রথের চাকায় নিজের জীবন বিসর্জন দিত এবং চাকায় পিষ্ঠ হয়ে

Scanned by CamScanner

মৃত্যুবরণ করত—এই রকম মৃত্যু বা আত্মবলিদান দেবতার কাছে নাকি পরম অর্ঘ হিসাবে গণ্য হত পুণ্য লাভের আশায়। কোন কোন যুবকও যুবতীরা আবার তাদের শরীরের মধ্য দিয়ে ফুটো করে শক্ত দড়ি গেঁথে মালা করে রথের সঙ্গে নরমালা দিয়ে সাজিয়ে ঝুলিয়ে দিত এবং এই অর্ধমৃত দেহগুলি ঝুলন্ত অবস্থায় মূর্তিটির সাথে শোভাযাত্রায় সামিল হত। এই প্রকারের আত্মবলিদান সর্বোত্তম বলে গণ্য হত। এরা ছিল সেই বিধান প্রদানকারী ব্রাহ্মণ, যারা নাকি বর্ণশ্রেষ্ঠ। পার্সিয়ার রাজা শাহরুখ, আব্দুল রজ্জাককে বিজয়নগর রাজ্যে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। ১৪১৩ খ্রীঃ আব্দুল রজ্জাক হিরাটে জন্মগ্রহণ করেন। মতিলাউস্-সাদেইন, ইলিয়ট IV গ্রন্থে (১০৫-১২০ পৃষ্ঠা) আব্দুল রজ্জাকের দেওয়া বিবরণী থেকেও বিজয় নগর রাজ্যের তখনকার অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা জানা যায়। তাঁর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, 'রাজা একজন দূত পাঠিয়ে আমাকে রাজ দরবারে আহ্বান করেন এবং সন্ধ্যার দিকে দরবারে গিয়ে পাঁচটি সুন্দর ঘোড়া, দামাস্ক ও সার্টিনের নয়টি বস্ত্রখণ্ড উপহার দিই। রাজা চল্লিশটি স্তম্ভসমন্বিত সুবৃহৎ দরবার কক্ষে সিংহাসনে বসে আছেন। বহু বহু সংখ্যায় ব্রাহ্মণজনতা ও অন্যেরা রাজার ডান বা বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে। এই ভাবে ব্রাহ্মণেরা রাজার সম্পর্কে অলীক গাঁথার সৃষ্টি করত,বিনিময়ে রাজানুকুল্য ও বিশেষ সুবিধা আদায় করত।

১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে মাহমুদ খলজী ও চিতোরের রানা কুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধে উভয় বিজেতা হিসাবে নিজেদের দাবী করে। রানা চিতোর জয়সূচক স্তম্ভ 'টাওয়ার অব ভিক্টোরি' এবং মাহমুদ মাণ্ডুতে 'সাততলা টাওয়ার' নির্মাণ করেন। মামুদের পুত্র গিয়াসুদ্দিন। পিতা গিয়াসুদ্দিনকে তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দিন খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করে। তাঁর হারেমে ১৫,০০০ রমনী থাকত, তাদের অনেকে যেমন সুন্দরী, তেমনি কলাকুশলী। তিনি এত বড় লম্পট ও অত্যাচারী ছিলেন যে কোন সুন্দরী কুমারী তার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেত না।

ঐতিহাসিক সেভেলের বিবরণে একটি নির্মম চিত্র পাওয়া যায় ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে তালিকোটের যুদ্ধে হুসেন নিজাম শাহ রাজা রাম রায়কে পরাস্ত ও বন্দী করে তাঁর দেহ থেকে মুণ্ডছেদন করেন।

Scanned by CamScanner

মুসলিমদের বিজয়নগর রাজ্যে এত নৃশংসতা ইতিহাসের পাতায় খুব কম দেখা যায়। মামুদ ও তৈমুরের পর হুসেন প্রায় ১,০০,০০০ বালক হিন্দুকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেন। পাঁচমাস ধরে রাজ্যের যাবতীয় বিখ্যাত স্থাপত্য ও হিন্দু সংস্কৃতি ধ্বংস করেন। নরসিংহ মূর্তি ও তুঙ্গা নদীর তীরে বিত্তল স্বামীর মন্দির জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভেঙে তছনছ করেন। বর্বর আক্রমন, ধ্বংস ও হত্যালীলা সেভেলের ভাষায় বর্ণনাতীত।

ঐতিহাসিক ইবন বতুতাও তাঁর বর্ণনায় ভারতের একই অবস্থার কথা বলেছেন। জাতি বর্ণ বৈষম্য, বহুধা বিভক্ত হিন্দু সমাজে কোন দিন ঐক্য ছিল না। আজও নেই। কে তাকে ভরসা দেবে, কে তাকে শোনাবে অভয়বাণী! ক্রন্দনরত অত্যাচারিত মানুষের পাশে কে দাঁড়াবে! যতদিন বৈষম্যের বেড়াজাল ভেঙে হিন্দুরা একসূত্রে ঐক্যে গ্রথিত না হতে পারছে, ততদিন এই দেশ আধা উন্নত দেশ হয়ে থাকবে, উন্নত দেশের মান পাওয়া অধরা থেকে যাবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলমান সংগঠন, নামদেব, কবীর ও নানক

মুসলিমদের সংগঠন নিয়মতান্ত্রিক এবং এক সূত্রে বাঁধা। তাদের বিশ্বজনীন ঈশ্বরতত্ত্ব ও একেশ্বরবাদ একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়। এই মহান ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যে উঁচুনীচু, ধনী-দরিদ্র এবং ছোট-বড় সবই সমান। মানুষে মানুষে তাদের কাছে কোন ভেদাভেদ ছিল না। প্রচারমূলক এই ধর্মে সবার প্রবেশ ছিল অনাবিল এবং ধর্মান্তরিকরণ ছিল একটি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিক যা তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় সংবদ্ধ জনসংঘ বা ফ্যালাক্স হিসাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। ঐতিহাসিক লেন-পুল বলেন, তাদের সংস্কৃতির সবচেয়ে গোঁড়ামির দিকে ছিল আত্ম-সংরক্ষণ, বিধর্মীদের সামনে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে তাদের আত্মরক্ষার জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হবে, এবং ধর্মান্তরিতদের তাঁরা উদ্বুদ্ধ করে বা অস্ত্র দ্বারা হিন্দুদের পরাস্ত করে নিজেদের রক্ষা করতে কসুর করত না এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তাদের রক্ষা করে ইসলাম ধর্মের ক্রমবৃদ্ধি ঘটাতে তারা পিছপা হত না। অপরপক্ষে হিন্দুরা ছিল বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং ফলতঃ দুর্বল এবং তাদের জাতিগত বিভাগের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। সাধারণ আত্মরক্ষা ও আত্মনিরাপত্তার মত বৃহত্তম স্বার্থের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জাতি উপজাতিগুলি কখনই ঐক্যস্থাপন করতে পারত না। কারণ তাদের জাতিভেদ প্রথা, জাতিগত ঔদ্ধত্য ও বিদ্বেষ, ছোট-বড় জাতি ও মানুষে ভেদাভেদ তাদের ঐক্যস্থাপনে বড় বাধার সৃষ্টি করেছিল। বাধাটা যে কৃত্রিম ও অযৌক্তিক তা তারা বুঝতে চাইত না। এমন কি অনেক বিশিষ্ট সেনাপ্রধানেরা এবং যোদ্ধারা জাতিভেদ ধারণা ও প্রভাবকে ঝেড়ে ফেলতে পারত না এবং প্রায়ই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের তীব্র আক্রমনের সামনে নিজেদের যুদ্ধশিবিরে হিংস্র বিবাদে লিপ্ত হত। আজও হিন্দুদের এই অনৈক্যই, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রথা ও জাতিঔদ্ধত্য ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নয়নের অন্তরায় এবং সবকিছু থাকা

Scanned by CamScanner

সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত একটি আধা উন্নত দেশ বলে বিশ্ববাসীর কাছে স্বীকৃত। বাস্তবে একেশ্বরবাদ হিন্দুদের কাছে অজানা ছিল না। কিন্তু তারা জেনেও হিন্দু গোঁড়ামি বা ব্রাহ্মণ্যবাদের সীমাহীন কুসংস্কারে নিমজ্জিত থাকায় জাতীয় ঐক্য ক্ষুদ্র স্বার্থে ধ্বংস হল। তা আজও সমান তালে চলেছে, যার শেষ কিনারা কোথায়? পরবর্তী কালে নামদেব কবীর এবং নানকের প্রচারের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের সুর বেজে ওঠে। তাঁরা জাতিভেদ, ঈশ্বরের বহুত্ববাদ এবং পুতুল পূজাকে নিন্দা করে পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান, এবং সত্য বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও জীবনে বিশুদ্ধতার উপর প্রচার করেন। হিন্দু, মুসলমান ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ও সব জাতির ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় এবং সবার কাছে সমান, যদি ভক্ত বা ঈশ্বর আরাধনাকারী সত্যপথ উপলব্ধি করতে চান তাহলে জাতিভেদের ও কুসংস্কারের শক্ত বেড়াজালকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করতে হবে। তাঁদের মধ্যে নামদেব অস্পৃশ্যজাতির মারাঠা সিদ্ধপুরুষ বা সাধু ছিলেন এবং একেশ্বরবাদের প্রচারক ছিলেন। মূর্তি পূজা এবং বাহ্যিক আচার কুসংস্কার পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান তিনি প্রকাশ করেন—

"তোমার (ঈশ্বর) কাছে আমি অন্ধ, হে রাজা (প্রভু) তোমার নামই প্রমাণ
আমি দীন হীন, তোমার নাম আমার বল,
তুমি উদার নদী, তুমি দাতা, তুমি অসীম সম্পদের মালিক,
তুমি একাই দাও আর নাও, অন্য কেহ নহে ঃ
তুমিই জ্ঞানী, তুমি দূরদর্শী, তোমার কাছে থেকে যে ধারনা আমি পাই,
হে নামের (নামদেব) প্রভু, তুমি সদা ক্ষমাশীল, হে ঈশ্বর।"

(অনুবাদ)

রামানন্দের প্রধানতম শিষ্য হল কবীর। তার জন্ম রহস্যময় এক ব্রাহ্মণ বিধবার গর্ভে। বিধবা মহিলা লোকলজ্জার ভয়ে তাকে একটি পুকুরের কাছে রেখে যায়। নিরু নামে এক তাঁতী তাকে তুলে নিয়ে বাড়ীতে যায়। নিরুর স্ত্রী গভীর স্নেহে তাকে লালিত পালিত করে। তাঁর চিন্তার সবটাই হিন্দু পটভূমি। তাঁর মতে বিভিন্ন ধর্মের লক্ষ্য এক, পথ ভিন্ন ভিন্ন। হিন্দু, তুর্কী সবই একই মাটির তৈরি বিভিন্ন পাত্র। পাথর পূজা ও গঙ্গায় পূণ্যস্নানে কি লাভ, যদি হৃদয় মন পবিত্র না থাকে?

পাপবিদ্ধ হৃদয় নিয়ে মক্কায় গিয়ে কিসের তীর্থলাভ। পুতুল পূজার তিনি নিন্দা করেন। পাথরপূজা করে, যদি ভগবানকে পাওয়া যায় তাহলে আমি পর্বত পূজা শ্রেয় বলব, বরং পাথরের সাহায্যে ময়দা কলে গম পেষাই হয় যা মানুষের কাজে লাগে। তিনি ব্রাহ্মণ ও মৌলবাদীদের এবং জাতিভেদ প্রথাকে নিন্দা করতেন—

"জাতিভেদ প্রথা একেবারেই বৃথা, যেমন সমস্ত রকম রঙই এক ও একমাত্র আলোর বিভিন্ন জ্যোতি, তেমনি মনুষ্য প্রকৃতির যে বিভিন্নতা একই মনুষ্যত্বের বিভিন্ন খণ্ড। ঈশ্বরের নিকটে যাওয়ার অধিকার ব্রাহ্মণের একচেটিয়া হতে পারে না। পবিত্র হৃদয়ের সব মানুষকেই তাঁর কাছে যাওয়ার একই অধিকার থাকা উচিত...।"

শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক, পিতা কল্যান চাঁদ দাস (কালু মেহতা বা মেহতা কালু নামে প্রসিদ্ধ) ও মাতা তৃপ্তার পুত্র গুরু নানক ১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর জেলা থেকে ৬৫ কিমি পশ্চিমে শেখুপরা অঞ্চলের তালবন্দী (বর্তমান নানকানা সাহিব) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা হিন্দু বণিক ছিলেন। মাতৃভাষা ছাড়া পার্সি ও আরবী ভাষা জানতেন। সুলতানপুর অঞ্চলের মুসলমান শাসক দৌলত খাঁ লোদীর অধীনে ভাণ্ডারের চার্জে কাজ করতেন। কিন্তু কাজ ছেড়ে দেন। ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে থেকে নিম্নজাতীয় মুসলিম মারদানাকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মপ্রচার করেন। তিনি আচরণ বিধিও আচারণের উভয়ের মাধ্যমে কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপাচার, মূর্তি বা পুতুলপূজা, জাতিভেদের ভেকধারী ধর্মীয় গুরু বা ব্রাহ্মণ ও অলীক বিশ্বাস প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রচার করেন। নীচুজাতের লোকদের নিয়ে একসঙ্গে থাকতেন।

বেঁচে যাওয়া খাদ্য নষ্ট না করে গরীব দুঃখীদের দান করতে বলতেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণবাদী মতবাদে অস্পৃশ্যতা ও অস্পৃশ্য লোকের স্পর্শজনিত দূষণকে একটি ঘৃণ্য চিন্তা ও মানসিকতার পরিচয় হিসাবে তা বর্জন করবার অনুশাসন দেন। মানুষ মানুষের ভাই (ব্রাদারহুড্)। ঈশ্বর সব মানুষের এক পিতা (ফাদারাহুড) মতবাদে প্রচার করেন অর্থাৎ আমাদের সংবিধানে যাকে সৌভ্রাতৃত্ব (ফ্রেটারনিটি) এবং সাম্য (ইকুয়ালিটি) বলে গৃহীত হয়েছে। জন্মের জন্য মানুষ কখনও পৃথক হয়

Scanned by CamScanner

না। হিন্দু বা মুসলমান আলাদা কিছু নয়। সমস্ত মানুষই সমান একই ঈশ্বরের সন্তান। সে কারণে তিনি সাধারণ রান্নাঘরের (কমন্ কিচেন) ব্যবস্থা করেন, পরে বৃহদাকারে লঙ্গর তৈরি করেন, যেখানে গরীব-দুঃখী, ধনী-দরিদ্র ও উঁচুজাত-নীচুজাত একত্রিত হতে পারে।

বিভিন্ন জাতি, শ্রেণী ও নারী পুরুষ সবাই একসঙ্গে একত্রে বসে খাওয়া-দাওয়া ও মিলিত হয়ে সাম্য, ঐক্যে, ভ্রাতৃত্বের বুনিয়াদ স্থাপনের একটি সোপান স্থাপিত হতে পারে। গরীবদের সাহায্য করার এটিও একটি পথ। গঙ্গাজল ছিটিলে যদি পরলোকগত বংশধরদের গায়ে গিয়ে লেগে পূণ্য হয় বা পাপমোচন হয়, তাহলে এখান থেকে জল ছিটালে তাঁর জমিতে গিয়ে পড়ে না কেন? সঙ্গী ভাই গুরুদার পাঞ্জাবী ভাষায় গ্রন্থসাহেব লেখেন, যা ধর্মীয় পরিব্রজনের সময় গুরু নানকদেবজি দোঁহাগুলো প্রচার করেন। সংস্কৃত বর্জন করে পাঞ্জাবী ভাষায় তাঁর শিক্ষা এবং উপদেশ প্রকাশ করেন ও 'গ্রন্থসাহেব' ধর্মগ্রন্থে সংকলিত করেন।

কারণ হিন্দু ব্রাহ্মণদের ধর্মশাস্ত্র একমাত্র সংস্কৃতে লেখা। আজ ভারতবর্ষের অমৃতসরে যে স্বর্ণমন্দির আছে সেখানে গিয়ে মানুষকে অভিভূত হতে হয়। পায়ে জল দিয়ে ধোয়ান, পায়ের জুতো পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখা, সবাইকে সমান দর্শনাধিকার, সবার সারাদিন রাত্র বছরের পর বছর খাবার প্রদান, সবার এঁটো থালা ঘটি বাটি ধোওয়া ও সেবাদান সবই ধনী দরিদ্র পাঞ্জাবী ছেলে ও মেয়েরা একমন্ত্রে ও একসূত্রে একই ঈশ্বরে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবসেবা তথা ঈশ্বরের সেবা করে চলেছেন। গোটা বিশ্বের কাছে এ এক অতীব বিস্ময়।

Scanned by CamScanner

সপ্তম অধ্যায়

বাবর, হুমায়ুন, আকবর, সালিমা বেগম, রানা প্রতাপ, বজবাহাদুর ও রূপমতি, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও মমতাজ এবং ঔরঙ্গজেব, তাজমহল, কোহিনুর ও ময়ূর সিংহাসন

বাবর (১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৪৮৩—২৬শে ডিসেম্বর, ১৫৩০) প্রায় দশ বছর যুদ্ধ করে সাময়িকভাবে দু'বার সমরখন্দ উদ্ধার করলেও (১৪৯৭—১৫০১) শেষ পর্যন্ত ১৫০১ সালে সিরদরিয়া নদীর সন্নিকটে সার-এ পলে পরাজিত হন এবং পরের তিন বছরের মধ্যে পূর্বপুরুষের রাজধানী সমরখন্দ ও তাঁর নিজের রাজ্য ফরগনা সম্পূর্ণভাবে হারান।

বাবর প্রথম ভারতের পাঞ্জাবে অভিযান করেন। ১৫২৬-এর ২১শে এপ্রিল প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে দিল্লির শেষ আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে হত্যা করে ও যুদ্ধে জয়লাভের পর ৪ঠা মে আগ্রায় উপস্থিত হন। তিনিই ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

এশিয়ার ইতিহাসে অন্য কোন মুসলমান শাসক অপেক্ষা বাবর উচ্চতর। তিনি ছিলেন সুন্নী মুসলমান। তিনি সুলতান মামুদ, হুসেন নিজাম শাহ বা তাঁর পুর্বপুরুষ খোঁড়া তৈমুরের মত চরম গোড়া নৃশংস ছিলেন না। শিয়াদের তিনি ঘৃণা করতেন। হিন্দুদের ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং জিহাদ কে পবিত্র কর্তব্য বলে চিহ্নিত করেন। রানা সংঘের বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর চমকপ্রদ ও সাহসিকতাপূর্ণ অভিযানকে রুচহীন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যা তাঁর মত শিক্ষিত সম্রাটের পক্ষে অশোভনীয়। তিনি সিক্রি এবং চান্দোরিতে বিধর্মীদের হত্যা করে তাদের মাথার খুলির টাওয়ার বা চূড়া নির্মাণ করবার আদেশে দেন। পৌত্তলিকাতায় বিশ্বাসীদের তিনি কখন দয়া

Scanned by CamScanner

দেখাননি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মোঙ্গল ও তুর্কিরা নৈতিকতার ধার ধরতেন না। এদের মধ্যে ছেলেদের ছেলেদের সাথে পায়ুকাম বা 'পেডেরাস্টি' (Pederaisty) সাধারণ ঘটনা ছিল। বাবর নিজেও আলেকজাণ্ডারের মতে 'গে' বা সমকামী ছিলেন এবং নিজে খোলাখুলি ইহাতে উৎসাহিত করতেন। উপপত্নী বা বারবনিতা রাখা একটা প্রচলিত রীতি ছিল। সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মত তিনি এত যুদ্ধে রত ছিলেন যে যৌন ক্রিয়াকলাপের খুব কম সময় পেতেন। গান ও কবিতা রচনা করতেন, যা আজও প্রচলিত আছে।

বাবরের লিখিত গদ্যগ্রন্থ "বাবরনামা" পৃথিবী বিখ্যাত উচ্চাঙ্গের জীবনকাহিনী আকবরের আমলে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কি থেকে পার্শি ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯২১-২২ সালে "Memoirs of Babur" নামে ইংরাজিতে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বইটি বাবরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার, তাঁর সংস্কৃতি ও কৃষ্টির এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনামণ্ডিত।

বাবরের নির্দেশে মীর বাকি ১৫২৮-২৯ সালে উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যার রামকোট পাহাড়ে সম্রাটের নামে "বাবরি মসজিদ" নির্মাণ করেন। ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগ একটি প্রতিবেদন দেন—পূর্বে ঐ স্থলে একটি মন্দির ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদী কোন কোন দল দাবি করে, "রাম মন্দির" ধ্বংস করে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এ বিষয়ে বহু বিতর্ক ও বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং আদালত পর্যন্ত গড়ায়। ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে ৬ ডিসেম্বর হিন্দু জাতীয়তাবাদী একটি দল (ভারতীয় জনতা পার্টির এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের করসেবকদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়, বিচারপতি মনমোহন সিং লিবারহানের প্রতিবেদন অনুসারে) বাবরি মসজিদ ধ্বংস করলে সারা ভারতে দাঙ্গা বাধার ফলে প্রায় ২০০০ মানুষের প্রাণ যায়। আজও বিষয়টি অমীমাংসিত ও ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে (Apex Court) বিচারাধীন।

Scanned by CamScanner

বিকানীর থেকে হুমায়ুন পশ্চাদাসারণ করলে অমরকোটের রানা তাঁকে সাদরে আশ্রয় প্রদান করেন। জালাল্দ্দিন মহম্মদ আকবর এই অমরকোটেই ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবরে জন্মগ্রহণ করেন। এখান থেকে হুমায়ুন ইরানে পলায়ন করলে তাঁর খুল্লতাত কামরান তাকে লালন পালন করেন। কান্দাহার জয়ের পর আকবর পিতা মাতাকে কাছে পান। আকবর বৈরাম খাঁর সঙ্গে পাঞ্জাবের কালানৌরে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। আকবর কালনৌরে থাকা কালীন পিতার মৃত্যু সংবাদ পান। যুদ্ধ শিবিরে চাঞ্চল্য দেখা দিল। হুমায়ুনের প্রতি গভীর শোক জ্ঞাপন করে এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ সেরে কালানৌরের একটি মনোরম বাগানে একটি টিলার উপর ১৪ বছর ৪ মাস বয়সী আকবরের সিংহাসন আরোহন সংক্ষিপ্ত সমারোহে সম্পন্ন করা হয়। হুমায়ুনের সমসাময়য়িক প্রিয় বন্ধু বৈরাম খাঁ ছিলেন আকবরের গৃহশিক্ষক, হুমায়ুনের প্রিয়পাত্র, একান্ত অনুগত কর্মচারী ও আধিকারিক, নাবালক আকবরকে পুত্রসম জ্ঞানে তার অভিভাবক হিসাবে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি হুমায়ুনের প্রতি এত বিশ্বস্ত, শ্রদ্ধাশীল ও অনুরক্ত যে শেরশাহ এমনকি গোঁড়া সুন্নি লেখক বাদৌনি শিয়ামন্ত্রী বৈরাম খাঁর দৃঢ় সচ্চরিত্রের জন্য তাঁকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। বৈরাম খাঁর সহায়তায় ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে হিন্দু সম্রাট হিমুকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়।

আকবরের সভাসদ ঐতিহাসিক আবুল ফজল (পিতা-পণ্ডিত আব্দুল লতিফ) বৈরাম খাঁ ও সম্রাট আকবরের মধ্যে চির বিচ্ছেদ ঘটানোর যে রাজ ষড়যন্ত্রের বা কোর্ট কন্সপিরাসির জাল বুনেছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বিধবা রাজমাতা আকবরের মা হামিদা বানু বেগম, আকবরের বিমাতা মাহাম অনঘ, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আধম খান এবং আত্মীয় দিল্লীর শাসক বা গভর্নর সিহাবুদ্দিন, বিয়ানার সম্রাট, আকবরের এক সময়ের প্রতিপালক খুল্লতাত কামরান খানের পুত্র আব্দুল কাসিম এবং সুন্নীপন্থী আমীর ওমারহরা এই গোপন ষড়যন্ত্রের শরিক ছিলেন। কামরানের

Scanned by CamScanner

পুত্রকে আকবরের স্থলে অভিষিক্ত করবে বলে আকবরের কান বিষাক্ত করেন। আকবর বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ব স্বীকার করতে চাইলেন না। হিন্দু রাজা হিমুর মত পরাক্রান্ত যোদ্ধার হাত থেকে বৈরাম খাঁ তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্য রক্ষা করে আকবরকে ভারতের সম্রাট হওয়ার পথ সুগম করে দিলেন। সমস্ত দিক দিয়ে আকবরকে পুত্রবৎ সুরক্ষিত রেখেছিলেন। তথাপি আকবর এই চক্রান্তে সামিল হয়ে তাঁকে মক্কায় হজ করতে যেতে বাধ্য করলেন। মক্কা যাওয়ার পথে গুজরাটের আহমেদাবাদের কাছে পাটানে তাঁকে গুপ্তহত্যা করা হয়, যে বৈরাম খাঁ ইচ্ছা করলে খুব সহজে আকবরকে তার নাবালক থাকাকালিন অবস্থায় সিংহাসনচ্যুত করতে পারতেন। বৈরাম খাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে আশ্রয় আকবরের সন্নিকটে আনা হয়। সবচেয়ে বিস্ময়ের পিতৃতুল্য ঐ ব্যক্তির অর্থাৎ বৈরাম খাঁর সুন্দরী বিধবা স্ত্রী সালিমা সুলতানা বেগমকে কোন রকম নীতির তোয়াক্কা না করে তাঁর পুত্র থাকা সত্ত্বেও আকবর তাঁকে বিয়ে করেন; সম্পর্কে তাঁর খুড়তুত বড়দিদি। মোগল সম্রাটের মধ্যে দেখা যায় তাঁরা যথেচ্ছাচার বিবাহ করত। আবুল ফজল বলেন, মাওয়াতীর জমিদারকে পরাস্ত করে তার বড় মেয়েকে হুমায়ুন ও ছোট মেয়েকে তাঁর প্রিয়বন্ধু বৈরাম খাঁ বিয়ে করে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। আজমেরের বিহারী মল বা ভারা মল যুবক সম্রাট আকবরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং সম্পর্ক স্থাপন করেন। আকবর তাঁর ছোট মেয়ে হীর কানওয়ার বা হরকা বাঈকে বিবাহ করেন। বিহারী মলের পুত্র ভগবান দাসকে আকবর তার জন্য উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন।

আকবরের ১৪টি স্ত্রী ছিল এবং তাদের মাধ্যমে ৫টি ছেলে ও ৩টি মেয়ের জন্ম হয়। মনসেরেটের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আকবরের ৩০০-এর অধিক স্ত্রী ছিল। আবুল ফজল বলেন ৫০০০-এর বেশী। মুসলিম নীতি অনুসারে চার জন নিকার স্ত্রী। হারেম বা উপপত্নীদের সংখ্যা নিয়ে এই তথ্য। বাদৌনির তথ্য অনুযায়ী কোন সুন্দরীর উপর নজর থাকলে মোঘল রীতি অনুযায়ী তাঁকে সম্রাটের সামনে তাঁর যৌন

Scanned by CamScanner

লালসার সামগ্রী হিসাবে হাজির করতে হত, কোন বাধা মানা হত না।

সুন্দরী মুরিয়াম উজ জামানি, সালিমা সুলতানা বেগম এবং রুকিয়া সুলতানা বেগম আকবরের স্ত্রী ও রাজবেগম ছিলেন। তৎ সত্ত্বেও আকবর ব্যভিচারের ঊর্দ্ধে ছিলেন না, ছোট বড় জমিদার বা জায়গীরদাররা তাদের জীবন, ধনসম্পদ, শান্তি বজায় রাখার কথা ভেবে তাদের ঘরের রমনীদের অবলীলাক্রমে সম্রাটদের হাতে তুলে দিত। জয়সালমীর ও বিকানেরের শাসকরাও আকবরের সঙ্গে তাদের ঘরের রমণীদের বিবাহ দেন। একামাত্র মেবারের রানা উদয় সিং এই ইতর সম্পর্ককে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তী রানা প্রতাপ সিং আকবরের অধীনতা মানতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। পরিণাম স্বরূপ হলদিঘাটের যুদ্ধ। আকবরের হিন্দু সেনাপতি আর এক রাজপুত মান সিং রানা প্রতাপের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সংকীর্ণ গিরিপথ ধরে রানার রাজধানী কুম্ভল গড়ের কাছে হলদিঘাটের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধ হিন্দু ও মুসলমানের যুদ্ধ ছিল না, এটি ছিল বিদেশীদের সাথে ভারতবাসীর যুদ্ধ। ভীল ও আফগান সেনারা রানা প্রতাপের সঙ্গে মোঘলের বিরুদ্ধে যোগদান করল। মোঘল সেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটতে সফল। আকবর স্বয়ং যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন এ প্রকার গুজবে রাজপুত শিবিরে যুদ্ধের পরিস্থিতি বদলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আকবরের সেনা বাহিনী প্রবল যুদ্ধে রানার একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধস্থল গোগুণ্ডা দখল করে নিল। রানা প্রতাপ যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে তাঁর বিশ্বস্ত যুদ্ধাশ্ব চৈতকের পৃষ্ঠে আরোহন করে লুক্কায়িত হন। ইনিই প্রথম ভারতবর্ষে 'গেরিলা' যুদ্ধের সূচনা করেন। দীর্ঘদিন গেরিলা যুদ্ধের দ্বারা আকবর ও তাঁর সেনাবাহিনীকে বিব্রত রেখেছিলেন। গেরিলা যুদ্ধের কৃতাকার্যতা দেখে পরবর্তীকালে দক্ষিণের মালিক অম্বর এবং শিবাজী গেরিলা যুদ্ধ সফলভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হন।

জাতি বিদ্বেষ, জাতীয় অনৈক্য, জাতিভেদপ্রথা, অস্পৃশ্যতা ও স্পর্শজনিত দূষণ ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ থেকে শুরু করে নিম্নে সাধারণ

Scanned by CamScanner

মানুষদের মধ্যে এত প্রবল ছিল যে ভারতবর্ষ এক জাতি, এক প্রাণ হয়ে কখনই গড়ে উঠতে পারেনি। সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হয়নি বলেই আজও ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও জাতিবিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, উন্নতদেশ হিসাবে বিশ্বের দরবারে মাথা তোলার পথে বাধা হয়ে আছে।

রাজা বিহারী মল তাঁর ছোট মেয়ে ছাড়া তাঁর বড় মেয়ে যোধা বাইকে যোধা বাঈ-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্থিরাবস্থা থেকে পরিত্রান ও মুক্তিপণ হিসাবে আকবরের সঙ্গে বিয়ে দেন। ইতিমধ্যে আকবরের দুটি স্ত্রী (একটি পুত্র সহ, যা আকবরের নয়) ছিল। আকবর ছিলেন অশিক্ষিত, যোধাবাঈ শিক্ষিতা, যোধাবাঈ নিরামিষাসী, আকবর সম্পূর্ণ আমিষাসী। যোধার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি আকবরকে বিবাহ করতে বাধ্য হন। যোধাবাঈ বা হরকা বাঈ দুই বোনই ছিল আকবরের জয়সূচক ট্রফি বা স্মারকোপহার, রাজনৈতিক অস্ত্র এবং দরকষাকষি। আকবরের প্রিয়তমা স্ত্রী রাকেয়া বেগমের কোন সন্তান ছিল না। আকবরের ঔরসজাত দুটি উপপত্নী বা রক্ষিতার গর্ভে দুটি সন্তান মুরাদ এবং ডানিয়েল, যাদের পরবর্তীকালে সম্রাট করা সম্ভব ছিল না (অবৈধ সন্তান বলে)। সেলিম চিস্তির দরগায় তাগা বেঁধে আকবরের বৈধ রাজপুত স্ত্রী যোধাবাঈ-এর গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মে ধর্মগুরু সেলিমের নামানুসারে তাঁর নাম রাখেন সেলিম, যার নাম পরে জাহাঙ্গীর রাখা হয়। অবশ্যই ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন হিন্দু রমনীর গর্ভজাত সন্তান জাহাঙ্গির রাজা হন, তা না হলে আকবরের পর মোঘল সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক বিনাশ ঘটত। এই জাহাঙ্গীরই আকবরকে বিষ প্রয়োগ করে মারার ষড়যন্ত্র করেছিলেন, আকবর নিজে সন্দেহ প্রকাশ করেন। আফিং, গাঁজা, মদ ও ড্রাগে আসক্ত ছিলেন জাহাঙ্গির। আকবরের বিখ্যাত পারসিক সভাকবি ফৈজির (২৪ সেপ্টেম্বর ১৫৪৭ —৫ অক্টোবর ১৫৯৫, লাহোরে জন্ম) ছোট ভাই আবুল ফজলকে

(১৪ জানুয়ারী ১৫৫১—১২ আগস্ট, ১৬০২, আকবরনামার লেখক) জাহাঙ্গীর চক্রান্ত করে হত্যা করেন। আবুল ফজলের মৃত্যুতে আকবর গভীরভাবে শোকাহত হন এবং বলেন, "সেলিম (জাহাঙ্গীর) বাদশাহ হতে চায়, সে আবুল ফজলকে না মেরে, আমাকে মারতে পারত।" মাথার টারবান খুলে আকবর মাটিতে লুটেয়ে কাঁদতে থাকেন। বহু স্ত্রীর মধ্যে আকবরের প্রধান কিছু স্ত্রীর নাম হল—মুরিয়াম-উজ-জমানি, রাকেয়া সুলতানা বেগম, সালিমা সুলতানা বেগম, (বৈরাম খার বিধবা স্ত্রী) কুইসামিয়াবানু বেগম, বিবি দৌলত শাদ, রাজিয়া সুলতানা বেগম, রাজকুমারী রুখমাবতী বাঈজিলাল, সাহিবা বাঈজিলাল, রাজ কানওয়ারী সাহিবা, তৌতি বেগম সাহিবা, রাজকুমারী মানভাওতি, যোধা বাঈ, হরকা বা হীরা বাঈ এবং আরও অনেকে। এক নর্তকী ছিল আকবরের প্রিয়। এ রকমই ব্যাভিচার, লাম্পট্য, গুপ্ত হত্যা, ষড়যন্ত্র মধ্যযুগের শাসককুলের চরিত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আকবরের ধর্ম নিরপেক্ষাতা প্রভৃতি বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনিও এসবের উর্দ্ধে ছিলেন না। তাঁর নবরত্নের সভায় অনেক ভারতীয় হিন্দু ছিলেন। বীরবল (মহেশ দাস, হিন্দু ব্রাহ্মণ ১৫২৮-৮৬, নীতি গল্পকর), রাজা টোডরমল উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার লোহাপুরের ক্ষেত্রি রাজপুত, প্রথম হিন্দু সেনাপতি, অর্থ ও ভূমি রাজস্বমন্ত্রী, এঁর এক বোনকে আকবর বিয়ে করেন। মিঞা তানসেন (১৪৯৩-১৫৮৬, গোয়ালিয়রের বেহাটে জন্ম, গোয়ালিয়রের রামচাঁদ তাঁকে বিখ্যাত গায়ক হিসাবে প্রকৃত নাম রামতনু পাণ্ডে থেকে তানসেন নাম দেন, সম্রাট আকবর তাঁর নামের আগে মিঞা আখ্যা দেন, সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী হরিদাস ও সুফী গায়ক গিয়াস মহম্মদের কাছে গানে হাতে খড়ি, ধ্রুপদ সহ নতুন নতুন রাগে সৃষ্টিকর্তা), ভগবান দাস ও রাজা মান সিং প্রভৃতি তাঁর সভার আকবরের দীন-ইলাহি ধর্মের প্রথম শিষ্য হলেন বীরবল।

শের শাহ সুরির অধীনস্থ গর্ভনর বা শাসক সুজাত খানের মৃ পর তাঁর পুত্র বজ বাহাদুর মধ্যপ্রদেশের (মাণ্ডির) মল্লের সুলতান

Scanned by CamScanner

নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। একবার শিকার অভিযানে যাত্রা করে শ্যামল অরণ্যক্ষেত্রের তরুরাজি ও লতাগুল্মাদির অভ্যন্তর ভেদ করে একটি গানের মধুর সুর সুলতান বজ বাহাদুরের কানে এসে পৌঁছাচ্ছে। সুলতান অগ্রসর হয়ে দেখতে পান পরমা সুন্দরী এক মেষপালিকা তার দলের সঙ্গী সখীদের নিয়ে গান গাইছেন। যাদুকরী মোহময় সুরে তিনি বন্দী হয়ে গেছেন। সুলতান অনুসন্ধান করে জানলেন এই অপরূপা বিরল সুন্দরী হলেন মেষপালিকা রূপমতি। সুলতান তৎক্ষণাৎ তার রূপে মুগ্ধ হয়ে, সুরেলা যাদুকরী গানে মোহিত হয়ে রূপমতির প্রণয়াসক্ত হয়ে এগিয়ে আসেন। মেষপালিকা রূপমতি একটি শর্তে প্রণয়াবদ্ধ হতে রাজি হন। সেই শর্তানুসারে সুলতান মাণ্ডির রেওয়াকুণ্ডে বিখ্যাত পুষ্করনী নির্মাণ করেন। যা আজ দেশ বিদেশের বহু সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি প্রভৃতি মানুষের দর্শনীয় স্থান হিসাবে বিখ্যাত হয়ে তাদের পরম ভালবাসার স্মারক হিসাবে বিরাজ করছে। সম্রাট আকবর ও তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই তথা সেনাধ্যক্ষ আদম খানের কানে রূপমতির অপরূপ সৌন্দর্য্য ও অসাধারণ সুরের গানের কাহিনী পৌঁছাল। আদম খান রূপমতির রূপ ও সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়ার পরিকল্পনা শুরু করলেন। ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে এক শুক্রবারে সারানপুরে বজ বাহদরের উপর সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন, শুধু রূপমতির সৌন্দর্যের ও রূপসাগরে নিজের কামানলে ডুব দিয়ে যৌনতৃষ্ণা চরিতার্থ করতে। কিন্তু পারলেন না। বজবাহাদুর পরাজয় বুঝে মাণ্ডু থেকে পলায়ন করলেন। সক্রেটিস বলেছিলেন, "দি হটেস্ট লাভ মে হাভ দি কোল্ডেস্ট্ এণ্ড্।" কারণ রূপমতি আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আদম খান তাঁর কাছে পৌঁছাবার আগে বিষপান করে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত এই অসামন্য রূপ লাবণ্যময়ীকে প্রত্যক্ষ দেখে তিনি অভিভূত ও ভেঙে পড়েন—হয়ত বা তার কাম-লালসাকে চরিতার্থ করতে না চাইলে এত গুণী ও সুন্দরী লাবণ্যময়ীর অকালে জীবনটা ঝরে যেত না। আদম খাঁন প্রেমের প্রতি বিশ্বস্ত, নিষ্পাপ প্রেমের সাক্ষ্য বহনকারী একটি প্রাণ, সুলতান বজ বাহাদুরের সমীপে একান্ত নিবেদিত প্রেমের সাক্ষ্য

বহনকারী একটি অপরূপ রমনীর এই আত্মত্যাগের প্রতীক, নারীর সম্ভ্রম রক্ষার সর্বশেষ স্থল এই আত্মবলিদানের দৃশ্য দেখে বিস্ময়াবিষ্ট ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং রূমতীর শেষকৃত্য অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন করে প্রত্যাগমন করেন। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, আকবরের সমসাময়িক এলিজাবেথ নির্লজ্জভাবে মিথ্যা কথা বলতেন, কিন্তু তবুও তিনি খ্রীস্টানদের জগতে তুলনাহীন। ফ্রান্স, স্পেন বা অন্যত্র শাসকরাও নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন ও চক্রান্ত করতে দ্বিধা করত না। আকবরের চরিত্র, রাজনীতি, মানবতা, প্রজামঙ্গলকামী নীতি, বদান্যতা, আচরণ প্রভৃতি তাঁর উন্নত মননশীলতার পরিচায়ক। তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে কিছু কিছু বিরূপ কাজের খতিয়ান বাদ দিলে তিনি মহামতি আকবর, অন্যদের থেকে ভিন্ন, পৃথিবীর ইতিহাসে একজন মানবতার প্রতীক ও যুগান্তকারী শাসক। স্মিথ আরোও বলেছেন, ‘‘সমসাময়িক ইউরোপিয়ান কোন সেনাবাহিনীর সামনে সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনী এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াতে সমর্থ হবে না। (আকবর পৃ. ৬৬-৬৭, ভিনসেন্ট স্মিথ)।

আকবরের পুত্র সেলিম বা জাহাঙ্গীরের বর্বরতার কথা আগে কিছুটা আলোচনা হয়েছে। আবুল ফজলকে হত্যা করেছেন। এসময় বাংলা অসন্তোষের অনলে জ্বলছিল। শের আফগানের ছত্রতলে আফগানরা সমবেত হচ্ছিল। শের আফগানের বিদ্রোহের সংবাদে জাহাঙ্গীর রাজা মান সিং-এর স্থলাভিষিক্ত কুতুবুদ্দিনকে বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠালে শের আফগান কুতুবুদ্দিনকে অস্ত্র দ্বারা কঠোর আঘাত হেনে মারাত্মকভাবে আহত করেন। কুতুবুদ্দিনের উন্মত্ত সেনাবাহিনী প্রত্যুত্তরে শের আফগানকে চরম আঘাত হেনে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলে দেন। শের আফগানের পরমা সুন্দরী মেহেরুন্নিসার রূপের কথা জাহাঙ্গীর জানতেন, কিন্তু আকবর তার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হন নি। মেহেরুন্নিসা ও তাঁর কন্যা ল্যাডলি বেগমকে রাজদরবারে এনে বিধবা রাজমাতা সালিমা সুলতানা বেগমের (বৈরাম খাঁর স্ত্রী, পরে আকবরের উপপত্নী) অধীনে সমার্পণ করা হয়। ১৬১১ খ্রীস্টাব্দের

Scanned by CamScanner

মার্চমাসে মেহেরুন্নিসার স্বামী শের আফগানের মৃত্যুর চার বছর পর একদিন ফ্যান্সি মার্কেটে মেহেরুন্নিসাকে জাহাঙ্গীর নিকট থেকে স্বচক্ষে দেখে তাঁর রূপের ছটায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। তখন মেহেরুন্নিসার বয়স ৩৪ বছর, কিন্তু এই বয়সেও তাঁর অনাঘ্রাত কুমারীর মত সৌন্দর্যের মুগ্ধতা অম্লান ছিল। জাহাঙ্গীর রাজা ভগবান দাসের কন্যা মানবাঈকে আগে বিয়ে করেন। মান বাঈ ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দে আত্মহত্যা করেন। জাহাঙ্গীর অপরূপা মেহেরুন্নিসাকে বিয়ে করেন পঁচিশতম স্ত্রী হিসাবে এবং নাম রাখেন নূরমহল, পরে নাম দেন নূরজাহান, (পৃথিবীর আলো) নূরজাহানের পরে আরোও পাঁচটি বিয়ে করেন জাহাঙ্গীর, জাহাঙ্গীরের মোট প্রধান ৩০টি স্ত্রী এবং ৭টি পুত্র ও ১৪টি কন্যা, যার মধ্যে ১০ জন শিশুকালে মারা যায়। ক্রিস্টোফার বায়ার্সের সূত্র থেকে তথ্যগুলি জানা যায়—

(১) যোধা বাঈ-এর ভাইঝি বা মানসিং-এর বোন সেলিম বা জাহাঙ্গীরের প্রথম স্ত্রী। ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর ১৩ তারিখে বিয়ে হয়। এই স্ত্রীর গর্ভের পুত্র খুসরু মির্জা।

(২) নূরপুরের বা ধামানির রাজা বাসুর কন্যা ফুল বেগমকে বিয়ে করেন।

(৩) যোধ বাঈ বা তাজবিবিকে ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে বিয়ে করেন, তার থেকে তৃতীয় পুত্র খুরম বা শাহজাহান ১৫৯২ এর ৫ই জানুয়ারিতে।

(৪) ও (৫) বিকানিরের মহারাজা রাই সিং-এর কন্যাকে ১৫৮৬-এর ৭ই জুলাই বিয়ে করেন এবং একই মাসে খাসগড়ের সুলতানের কন্যা মালিকা বেগমকে বিয়ে করেন। ৬ বছর পর মালিকা বেগমের মৃত্যু হয়।

(৬) হিরাটের খাজা হোসেনের মেয়ে সাহিবি জামাল বেগমকে ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে বিয়ে করেন এবং দ্বিতীয় পুত্র পরভেজ মির্জা ও পঞ্চম পুত্র সুলতান সাহারিয়ারে জন্ম হয়। ১৫৯৯-এ সাহিবির মৃত্যু হয়। (নূরজাহানের কন্যা ল্যাডলির সঙ্গে সাহারিয়ারের বিবাহ হয়।)

Scanned by CamScanner

(৭) ১৫৮৭ খ্রীস্টাব্দে মালিকা জাহানকে,

(৮) রাজা দারিয়া মালতাসের কন্যাকে এবং

(৯) মির্জা সঞ্জার হাজরার কন্যা জোহোরা বেগমকে ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দে বিয়ে করেন।

(১০) ১৫৯১ খ্রীস্টাব্দে মেরিটের রাজা কেশো দাসের রাজপুত কন্যা রাজকুমারী করম্‌সী বাঈজি লাল সাহিবাকে বিয়ে করেন।

(১১) একই বছরে মহম্মদ খাজা জাহান ই কাবুলির কন্যাকে বিয়ে করেন।

(১২) আরিয়া কাশ্মীরি বোনকে।

(১৩) কাশ্মীরের লাদাকের আলি শেরের কন্যা কানাওয়াল রানীকে বিয়ে করেন।

(১৪) কাশ্মীরের মুবারক খানের কন্যা এবং

(১৫) কাশ্মীরের হুসেন চকের কন্যাকে বিয়ে করেন

(১৬) ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দে ইব্রাহিম হোসেনের কন্যা নূরুন্নিসা বেগমকে বিয়ে করেন।

(১৭) খানদেশের রাজ ফারুকির কন্যা এবং

(১৮) বালুচের আবদুল্লা খানের কন্যাকে বিয়ে করেন।

(১৯) জৈন খান কোকার কন্যা খাস মহল সাহিবাকে ১৫৯৬-এর জুন মাসে বিয়ে করেন।

(২০) কোটার ঠাকুর মানচাঁদের (পরে মোমান মুরাদ) কন্যাকে বিয়ে করেন।

(২১) ১৬০৮-এ সালিহা বানু পাদশাহ বেগম সাহিবকে বিয়ে করেন।

(২২) অম্বরের যুবরাজ জগৎ সিং বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা কোকা কুমারী সাহিবাকে বিয়ে করেন।

(২৩) ওরচা ও আন্দ্রির রাজা রাম চাঁদ জু দেও-এর কন্যাকে বিয়ে করেন।

—৪

Scanned by CamScanner

(২৪) ওরচার রাজা সোয়াই রাজা মধুকর শাহ বু বাহাদুরের কন্যাকে বিয়ে করেন।

(২৫) নূরজাহানকে বিয়ে করেন। শের আফগানকে হত্যা করে তাঁর স্ত্রী মেহেরুন্নিসাকে (নূরজাহান) বিয়ে করেন। প্রথম জীবনে আকবরের প্রবল আপত্তির জন্য মেহেরুন্নিসাকে বিয়ে করতে পারেননি।

(২৬-৩০) নূরজাহানের পরে জাহাঙ্গীর আরোও পাঁচটি বিয়ে করেন।

নূরজাহান অত্যন্ত সাহসী ও প্রবল শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। হিংস্র বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে শিকারের সময় নির্ভুলভাবে গুলিবিদ্ধ করে বহু বাঘ হত্যা করেছেন। জাহাঙ্গীর তাঁর এই নৈপুন্যের জন্য এক লক্ষ টাকার হীরের ব্রেসলেট উপহার দেন এবং ভৃত্য ও গরীব জনগণকে ১০০০ আসরফি বিতরণ করেন। লম্পট, চরিত্রহীন, মদ, মাদক ও ড্রাগ আসক্ত জাহাঙ্গীরের পক্ষে দেশ শাসন করা কঠিন ছিল। নূরজাহানই তাঁর বিচক্ষণতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে জাহাঙ্গীরের শাসনকার্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার (হিস্টোরি অব্ ঔরঙ্গজেব' ভলিউম-১, পৃঃ-২) লেখেন, বৃদ্ধ জাহাঙ্গীর নূরজাহানেরপ্রতি প্রেমান্ধ হয়ে পড়েন এবং তাঁর প্রতি চরম দুর্বল হয়ে যান। সেই সুযোগ নিয়ে নূরজাহান নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাহাঙ্গীরের উপরে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। শাহজাহানকে বঞ্চিত করেন। যার ফলে ১৬২২ খ্রীস্টাব্দের পরে শাহজাহান আত্মরক্ষার জন্য বিদ্রোহ করেন। শেষ জীবনে জাহাঙ্গীরের বিচক্ষণ বন্ধু বলতে মদ (Prudent Friend)। নূরজাহান তাঁকে সুখের শেষ সীমার নিয়ে যেতেন, কয়েক টুকরো মাংস ও মদ দিয়ে শান্ত করতেন। শেষ জীবনে নিজের হাতে মদ পানের ক্ষমতা ছিল না, নূরজাহান মদের গ্লাস গালে ধরে খাওয়াতেন, আর জাহাঙ্গীর মদাসক্ত ও নেশাগ্রস্ত হয়ে বলতেন, নূরজাহান রাজ্যপাট বা স্টেট অ্যাফায়ার্স দেখার জন্য একজন অতুলনীয় সম্রাজ্ঞী।

মুসলিমদের হাতে প্রায় এক হাজার বছর ধরে বিশেষ করে

Scanned by CamScanner

১০০০-১৫২৫-এর মধ্যে হিন্দুহত্যালীলা চলে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই বৃহত্তম হত্যাকাণ্ড। এই সময়ে প্রায় ৮ কোটি হিন্দু হত্যা হয়। প্রোফেসার কে. এস. লালের 'গ্রোথ অব মুসলিম পোপুলেশন্ ইন্ ইণ্ডিয়া', ইলিয়টের বর্ণনা, ফেরিস্তার বিবরণী থেকে এইসব তথ্য জানা যায়। ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দে পরে পিটার মাণ্ডি (ইউরোপীয় পর্যটক) আকবরের শাসনকালের ৭৫ বছর পরে শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের সময় ভারতে আসেন। তিনি নিজের চোখে শাসকদের তৈরী করা মানুষের মাথার খুলির টাওয়ার বা পাহাড় দেখেছেন। বাবর থেকে সুরু করে সব সম্রাটই এমনকি আকবর পর্যন্ত হিন্দুহত্যালীলা সম্পন্ন করে দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে মাথার খুলি দিয়ে ভিক্টোরি টাওয়ার নির্মাণ করে উচ্ছ্বসিত আনন্দ উপভোগ করতেন। কাফের হিন্দুদের হত্যা করার জন্য আকবর গাজী উপাধি পান। হিন্দু রমণী অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্মান্তরিতকরণ, শিশুদাসপ্রথা, মন্দির ধ্বংস, আইডল বা দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে ধ্বংস করা নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। ৮০০ থেকে ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত চরম পর্যায়ে এই ধ্বংসলীলা চলতে থাকে। এই হত্যাকাণ্ড নুরেনবার্গ ট্রায়েলের পর ন্যাজিবাহিনী কর্তৃক ইহুদী নিধনকে ছাড়িয়ে যায়। ফারনান্দ ব্রোডেলের 'এ্যা হিস্টোরি অব সিভিলাইজেশন'-এ উল্লেখ আছে, চরম সন্ত্রাস, অগ্নি সংযোগ, মন্দির ও পুতুল ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ, জোর পূর্বক ইসলাম ধর্মে অন্তরিতকরণ, নৃশংসতা, ধর্ষণ, হত্যা, হারেমে হিন্দু রমণী গ্রহণ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চলত। বাবরের যৌনবিকার রোগ হওয়ার জন্য হারেম করেন নি। তিনি সমকামী ছিলেন। কিন্তু আকবরের হারেমে হাজার হাজার হিন্দু বিশেষ করে রাজপুত রমণী রাখা ছিল। দুজন বিদেশিনী অর্থাৎ একজন আমেরিকান ও আরেকজন রাশিয়ান রমনী আকবরের হারেমে বিরাজ করত। লাম্পট্যে আকবর কারুর চাইতে কম ছিলেন না। হিন্দুদের প্রতি কোন প্রকার দয়া দেখান হত না। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে জীবনটা বাঁচত। বিধর্মীদের (মুসলিম ছাড়া অন্যদের বিধর্মী বা কাফের মনে করত) হত্যা করলে তাঁরা ধর্মীয় উপাধি পেত, হিন্দুনারীকে

Scanned by CamScanner

ধর্ষণ করলে শাস্তির বদলে উৎসাহিত করা হত। কুতুবুদ্দিন আইবক (দিল্লীর প্রথম সুলতান, ১১৯৬-১২১০ A.D.) মীরাট দখল করে মীরাটের সমস্ত মন্দির ধ্বংস করে সেইসব জায়গায় মসজিদ তৈরি করেন (সূত্র-হাসান নিজাম-ই নৈসাপুরির "তাজ-উল-মাসির")। আলিগড় জয় ও দখল করে সমস্ত হিন্দুদের অস্ত্র প্রয়োগ করে ইসলামে দীক্ষিত করেন, যারা দীক্ষিত হন নি তাদের নৃশংসভাবে মস্তক ছেদন করেন। পার্সিয়ান ঐতিহাসিক তাঁর "তাজিয়াত-উল-আমসার"-এ লিখেছেন, আলাউদ্দিন খলজি কাম্বে উপসাগরের কাছে কম্বেট দখল করে ইসলামের গৌরবের জন্য প্রায় সমস্ত হিন্দু হত্যা করে রক্তের নদী বয়ে দেন, আর প্রায় ২০ হাজার হিন্দু রমণীকে তাঁদের সোনাদানা সহ হারেমে নিক্ষেপ করেন, ব্যক্তিগত দাসী হিসাবে ব্যবহার করাতেন, উপভোগ করতেন ও ঈর্ষাতে ফেটে পড়তেন। পরাক্রমশালী রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হওয়ার জন্য আকবর রাজপুত রমণীদের বিবাহ করেন—অনেক ঐতিহাসিকদের এইমত অনেকেই গ্রহণ করেন না। ভিন্ন যৌন আকাঙ্খা পূরণের জন্য তিনি একের পর এক রাজপুত হিন্দু রমণীদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসেন, এই সব রমণীদের খুশীতে রাখার জন্য তিনি ফিরদৌসে মিরত্ত স্থাপন করেন।

এই যুগে নরহত্যা, দাসত্ব, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, ধর্মস্থান ও মূর্তি ধ্বংস, হিন্দু শিল্পকলা ধ্বংস, দারিদ্র্য, শোষণ, অপমান, দুর্ভিক্ষ, বলপূর্বক ইসলামে শিক্ষাদান, বুদ্ধিজীবীদের ও জ্ঞানীদের পতন, সামাজিক অধঃপতন ও সামাজিক কুকার্যবৃদ্ধি চরম আকার ধারণ করে। নির্বিচারে এত হিন্দু হত্যা হয় যে উত্তরের ঐ অঞ্চলটি হিন্দুকুশ নামে প্রখ্যাত হয়। হিন্দুকুশ অর্থাৎ হিন্দু নিধন। কৃষকদেরও মাফ করা হত না। আকবর যখন চিতোর জয়ে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং রীতিমত জয়লাভের আশা ক্ষীণ বলে মনে করেন তখন তিনি নির্বিচারে ৩০ হাজার কৃষক হত্যা করেন ও রমনীদের হারামে নেন। রানাদের আতঙ্কিত করবার জন্য মাথার খুলি দিয়ে টাওয়ার বানান। বাবরের বানান মাথার খুলির টাওয়ার পিটার মান্ডি

১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে নিজে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যে মুসলমানরা ভারতের মত এত বড় বিশাল দেশে ভাতের থালায় এক চিমটি নুনের মত আকারে ছিল, তা চরম বিস্তার লাভ করতে থাকল। গরীব একটা মুসলমানের বাড়ীতেও অনেক হিন্দু ক্রীতদাস থাকত। মাসুদ গজনী ১৭ বার ভারত আক্রমনে প্রায় দু'লক্ষ লোকের প্রাণ যায়। একটা সময় দেখা যায় খলিফা এক পঞ্চমাংশ বন্দী দাসের ভাগ পান, যার পরিমান ১,৫০,০০০ অর্থাৎ ৭,৫০,০০০ বন্দী, যার ৫, ০০০০ গজনীতে নিয়ে যাওয়া হয় (সূত্র-মামুদের সচিব অল্-উতবির বিবরণ)। তাঁর মধ্যে বহু সুন্দরী ললনাদের নিয়ে যাওয়া হয়। আইবক রাজা ভীমের কাছ থেকে ২০,০০০ ক্রীতদাস এবং কালিঞ্জরে ৫০,০০০ ক্রীতদাস নেন। ক্রীতদাস ছিল প্রচুর পরিমানে, আকবর ১৫৫৬-এর ৫ই নভেম্বর দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে হিন্দু বীর সেনাপতি হিমুকে (মোট ২৬টি যুদ্ধ জয় করেন পরপর) পরাস্ত ও হত্যা করার পর হিমুর অধিকৃত বিরাট সেনাবাহিনী এবং আত্মসমার্পণ করেছে এমন বহু সেনাদলের সেনাদের ছেদিত মস্তক দিয়ে 'ভিক্টোরি টাওয়ার' তৈরি করেন (পিটার মাণ্ডীর বিবরণ)। হিমুর ছেদিত মস্তক কাবুলে পাঠান। তাছাড়া ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দের ২৪এ ফেব্রুয়ারী চিতোরের পতনের পর বন্দী নিরস্ত্র নিরীহ ৩০,০০০ হিন্দু কৃষকদের হত্যা করে তাদের মাথার খুলি দিয়ে ভিক্টোরি টাওয়ার বানান। হিমুর পিতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে আকবর তাকে হত্যা করেন।

শাহজাহান জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র। ১৫৯২ খ্রীস্টাব্দে ৫ই জানুয়ারী জাহাঙ্গীরের প্রধান ত্রিশটি স্ত্রীর অন্যতম স্ত্রী রাজপুত রাজকুমারী যোধাবাঈ বা জগৎ গোসেনের গর্ভে লাহোরে জন্ম গ্রহণ করেন। এসময় আকবর জীবিত ছিলেন। আবুল ফজল বলেন, মোটা রাজা যোদপুরের উদয় সিং-এর কন্যার গর্ভে সালিমের (জাহাঙ্গীর) একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। রাজপ্রাসাদে ঘটা করে উৎসব পালিত হয়। রাজপুত্রের নাম রাখা হয় সুলতান খুর্‌রম্ (আনন্দদায়ক)। পরে নাম হয় শাহজাহান। (আকবরনামা-III পৃষ্ঠা-৬০)

Scanned by CamScanner

মুঘলযুগে আনুক্রমিক শাসকবর্গ ঃ—

মোট ২১ জন; বাবর (১৫২৬-১৫৩০), হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৪০, ১৫৫৫-১৫৫৬) আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭) শাহারিয়ার (১৬২৭-২৮) শাহজাহান (১৬২৮-১৬৫৮) ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) মুহম্মদ আজম শাহ (১৭০৭-titular) বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২) সর্বশেষ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৭), মুঘল রাজ ধ্বংস এবং বৃটিশ রাজ প্রতিষ্ঠিত।

১৬১২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নূরজাহানের ভাই আসফখানের কন্যা অর্জুমান্দ বানু বেগমের (মমতাজ মহল বা লেডি অব্ দি তাজ) সঙ্গে শাহজাহানের বিবাহ হয়। চরম রক্তক্ষয়ী প্রাসাদযুদ্ধে শাহরিয়ারের পক্ষে নুরজাহান এবং শাহাজাহানের সমর্থনে আসফ্খান্ সিংহাসন দখলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। নৃশংস ভাবে রাজপুত্রদের হত্যা করা হয়, রাজপুত্রের সমর্থকদেরও নির্বিচারে হত্যা করা হয়। বহু রাজরমনী এই ভয়াবহ ধ্বংস ও মৃত্যুলীলা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। এই রক্তবন্যার মধ্য দিয়ে খুররম্ শাহজাহান নাম ধারণ করে ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী সিংহাসন আরোহন করেন।

শাহজাহান হৃদয় দিয়ে মনপ্রাণ উজাড় করে মমতাজকে ভালবাসতেন। ভিনসেন্ট স্মিথ্ লেখেন (অক্সফোর্ড হিস্টোরি, পৃঃ ৩০৫), পরমতম ভালবাসার নিদর্শন হিসাবে তিনি মমতাজের নামে 'তাজমহল' নির্মান করেন, যা তাঁদের দাম্পত্য জীবনের ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসাবে আজও স্মরণীয়। মমতাজ তাঁর চর্তুদশ সন্তান এক কন্যাকে জন্মদান করে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রসবজনিত জটিলতাই মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুশয্যায় কন্যা জাহানারাকে দিয়ে শাহজাহানকে ডেকে এনে শয্যাপাশে বসিয়ে তাঁর সন্তানদের এবং বৃদ্ধ পিতামাতাকে সযত্নে প্রতিপালন করবার অনুরোধ জানিয়ে ১৬৩১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুন ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

Scanned by CamScanner

তাজমহল নির্মাণের প্রধান স্থপতি পার্সিয় বংশোদ্ভূত ভারতীয় ওস্তাদ আহমাদ লাহরি ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে আগ্রায় যমুনা নদীর দক্ষিণ পাশে ৪২ একর জমির উপর তাজমহলের নির্মাণ কার্য শুরু করেন। ভারতীয়, পার্সিয়, ওটোম্যান ও ইউরোপীয় শ্রমিক মিলে প্রায় ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) শ্রমিক নির্মাণ কার্যে নিয়োজিত হয়। ১৬৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দে মূল সৌধ (mausoleum) বা সমাধিমন্দিরের নির্মাণ কার্য শেষ হয়। আনুষঙ্গিক অট্টালিকাদির নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৬৪৩-এ। সুসজ্জিত করবার কাজ শেষ হয় ১৬৪৭-এ। বিস্তৃত সৌধের মধ্যভাগের ভিত ২৩ ফুট উঁচু। কেন্দ্রস্থলের বর্ণাঢ্য গম্বুজটি ২৪০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট, যাকে ঘিরে আছে চার কোণে ৪টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার গম্বুজ। বিস্তীর্ণ সমাধিমন্দিরের উপরিভাগ দেশ বিদেশের মূল্যবান শ্বেতপাথরে মোড়া। সূর্য ও চন্দ্রের কিরণের প্রতিফলনের প্রাবল্য অনুসারে পাথর থেকে বিভিন্ন রঙের প্রভা প্রতিফলিত হয়ে মনোরম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। সমগ্র কমপ্লেক্সটির নির্মাণ কার্য শেষ হতে সময় লাগে ২২ বছর এবং খরচ হয় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। পৃথিবী বিখ্যাত এই সৌধটি সপ্তম আশ্চর্যের একটি। পৃথিবী জুড়ে খ্যাত এই সৌধটি দেখতে সারা বছর অসংখ্য পর্যটক এখানে আসেন।

শাহজাহান তাঁর ৩০ বছর রাজত্বকালে তাজমহল, আগ্রা ফোর্টের সম্পূর্ণ মার্বেল আবৃত্ত করে নির্মাণ, রাষ্ট্রীয় স্মৃতি স্তম্ভ, রাজপ্রাসাদ ও বহু কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করতে কমপক্ষে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে রাজকোষ প্রায় শূন্য করে ফেলেন।

পৃথিবী বিখ্যাত হীরা 'কোহিনুর' অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলায় কৃষ্ণা নদীর তীরবর্তী কোল্লুর খণিতে প্রাপ্ত হওয়ার পর ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানকে উপহার দেওয়া হয়। এর ওজন ১৯১ ক্যারেট (৩৮.২ গ্রাম)। এর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্য পুণরায় কাটা হলে ওজন কমে হয় ১০৯ ক্যারেট। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের ভিন্ন ভিন্ন মত যাই থাক, ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে ইরানের শাসক নাদির শাহ দিল্লী জয় করে দিল্লী লুঠ করেন ও লুণ্ঠিত সামগ্রীর সঙ্গে কোহিনুরও লুঠ করে ইরানে নিযে যান। নাদির শাহর মৃত্যুর পর তাঁর সেনাধ্যক্ষ আহমদ শাহ এটি হস্তগত করেন ও

Scanned by CamScanner

পরে আহমদ শাহের বংশধর শাহ সুজার হাতে কোহিনুরটি চলে আসে। শিখ শাসক রণজিৎ সিং ভারতে পলাতক এই শাহসুজাকে কোহিনুর ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেন। ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে বৃটিশ কর্তৃক পাঞ্জাব সংযুক্তিকরণের সময় কোহিনুর বৃটিশদের হাতে চলে আসে এবং এই মহামূল্যবান রত্নটি রাণী ভিক্টোরিয়ার রত্নগারে স্থান পায়। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ষষ্ঠ জর্জের পত্নী রানী এলিজাবেথের ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রীয় রত্ন হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়। কোহিনুর কথার অর্থ হল 'আলোর পাহাড়' বা মাউন্টেন অব লাইট' এটি ডিম্বাকৃতি এবং ৩.৬ সেমি x ৩.২ সেমি x ১.৩ সেমি পরিমাপের।

শাহাজাহান তাঁর সুসজ্জিত অলংকৃত 'ময়ূর সিংহাসনে'—এই বহুমূল্যা হীরার কোহিনূরটিকে স্থাপিত করেন। ভারত সরকার, পাকিস্থান, ইরান ও আফগানিস্থান প্রত্যেকেই এর দাবীদার হিসাবে ফেরৎ চাইছে। কিন্তু বৃটিশ সরকার 'লাহোর চুক্তি' অনুযায়ী এর বৈধ অধিকারী হিসাবে দাবী করে তাদের হেফাজতে রেখেছে।

১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে শাহজাহান স্বর্ণকার বেবাদল খানকে দিয়ে ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করান। সাত বছর সময় ধরে নির্মান কার্য শেষ হয়। ১৬৩৫ খ্রীস্টাব্দে আগ্রাতে সম্রাট শাহজাহান এই ময়ূর সিংহাসনে বসেন, এর পাদানি রূপার এবং স্বর্ণ ও রত্নখচিত। পিছনে বহমূল্য রত্নখচিত খোলা ময়ূরপুচ্ছদ্বয়। হীরা, রুবি, চুনি ও মণিমানিক্য দিয়ে সজ্জিত ও মিনা করা এই সিংহাসনের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট, প্রস্থ ৫ ফুট এবং উচ্চতা ১০ ফুট। পৃথিবী বিখ্যাত এই মহামূল্যবান সিংহাসনটি পারস্য সম্রাট নাদিরশাহ ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী অধিকার করে ও লুণ্ঠন করে যুদ্ধ পারিতোষিক হিসাবে পারস্যে নিয়ে যান এবং তারপর এটি চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়।

শাহজাহান স্থাপত্য ও শিল্পের চরম উৎকর্ষতার পৃষ্ঠপোষক ও তাঁর এসব অমর কীর্তি তাঁকে পৃথিবী জুড়ে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। কিন্তু এসবের ফলে রাজকোস শূন্য হয়ে যায়, দেশে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে, প্রজাগণের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে।

Scanned by CamScanner

ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি মিশ্রিত চরিত্রের ছিলেন। তিনটি বিবাহ করেন এবং প্রতিটি মুসলিম কন্যা যার মধ্যে দ্বিতীয় স্ত্রী মমতাজ। ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে নবনির্মিত সমস্ত হিন্দুমন্দির ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। আগ্রা ও লাহোরে খ্রীস্টান চার্চগুলো ধ্বংস করেন। হুগলীতে পর্তুগীজ বসতি আক্রমন করেন এবং হাজার হাজার পর্তুগীজকে নানা অজুহাতে হত্যা করেন। তিনি তার শাসনকালের প্রথম দিকে শুধুমাত্র বেনারস বা বারানসীতে ৭৬টি নতুন মন্দির ধ্বংস করেন। শুধু হিন্দু বা অন্যধর্ম নয়, এমনকি শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমদের প্রতিও তিনি নৃশংস ছিলেন। পাঞ্জাবের কিছু সংখ্যক হিন্দু মুসলিম মহিলাদের বিয়ে করে। শাহাজান তাঁদের কঠোর শাস্তি প্রদান করেন এবং মুসলিম মহিলাদের ছিনিয়ে এনে অন্য মুসলিমদের সাতে পুণরায় বিবাহ দেন। ৪০০ হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রক্ষা পান। পাঞ্জাবে ৭টি মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন এবং ৩টি হিন্দু মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করেন। (কাজ্বিনির পাদশাহনামা এবং মুলক্খাসে বর্ণিত)। যে সব 'জমিদার' মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে, বা মুসলমান নারী বিবাহ করে মুসলমান হয়েছেন তাদের রাজা উপাধিতে ভূষিত করে ইসলাম ধর্মের পথ প্রশস্ত করেন। মানুক্কি (manucci) বলেছেন শাহজাহান বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর লাম্পট্য, মদনমত্ততা এবং উদ্দাম সুরা পান চালিয়ে গেছেন। বার্ধক্যের সময়েও তাঁর তারুণ্যের উচ্ছৃঙ্খলতা বজায় ছিল। বার্ধক্যেও তিনি সমান ভাবে মদ্যপান করতেন ও নারীলোলুপতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, যার ফলে তিনি সরকারের কাজে অবহেলা দেখাতে সুর করেন। পরিণাম ফল হিসাবে তাঁর চার পুত্র দ্বারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব এবং মুরাদের মধ্যে সিংহাসন দখল নিয়ে চরম বিবাদ এবং খুনোখুনি সুরু হয়। শেষ পর্যন্ত চরম নৃশংসতার মধ্য দিয়ে ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন। ঔরংজেবের নৃশংসতা ও বর্বরতা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

ঔরঙ্গজেব মথুরাতে মুরাদকে ভুরিভোজ ও পানভোজে সাদর আমন্ত্রণ জানান। মুরাদ পরম হৃদয়ভরে ভোজন করেন। মদ্যপান ছিল

Scanned by CamScanner

তাঁর প্রধান চারিত্রিক দুর্বলতা (foible) যা মারাত্মক মৃত্যুফাঁসে পরিণত হল। চরম মদ্যপান করে গভীর নিদ্রামগ্ন হন। অল্পক্ষণ পরেই সে নিজেকে ভ্রাতা ঔরংজেবের হাতে বন্দী দেখতে পেলেন। সোনা মুক্তোর হার সোনার শিকল হয়ে তার পায়ে বেড়ি পরাল। এখন সে ঔরঙ্গজেবের কারাগারে একজন বন্দী ছাড়া আর কেউ নন। চরম বিব্রত ও ক্রোধান্বিত হয়ে বন্দী বাঘের মত ফুঁসতে থাকলেন আর কোরাণের শপথ ভঙ্গ করার জন্য ঔরঙ্গজেবকে মুহুর্মুহু অভিসম্পাত করতে থাকলেন। বন্দী রাজপুত্রকে গোয়ালিয়রের ফোর্টের কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। পালাবার সমস্ত চেষ্টাই তাঁর ব্যর্থ হল। দেওয়ান আলি নাকির হত্যাকাণ্ডের বিচারে মুরাদকে দোষী সাব্যস্ত করে ঔরঙ্গজেবের কাজি তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। রায় তৎক্ষণাৎ কার্যকর করে ১৬৬১ সালে ৪ঠা ডিসেম্বরে রুদ্ধ কারাগার কক্ষে মুরাদকে হত্যা করে একজন সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিরতরে নির্মূল করে দিলেন, আর দেখাতে চাইলেন, নরহত্যার বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের বিনা অপরাধে কি নির্মম পরিণতি! আর কোরাণকে বুড়ো আঙ্গুল দেখান সত্যিই কি একজন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির কাজ!

ঔরঙ্গজেব তাঁর দাদা পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার প্রতি অতি চরম অমানবিক আচরণ করেন। বিভিন্ন যুদ্ধে অসফলতার পর প্রাণ ভয়ে দারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। হতভাগ্য রাজপুত্র বালুচির প্রধান মালিক জিওয়ানের কাছে আশ্রয়ের জন্য দাদরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কারণ এক সময়ে দারা মালিক জিওয়ানকে রাজহস্তের চরম আক্রোশ থেকে উদ্ধার করেন। পরিব্রাজক বার্ণিয়ার তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, তাঁর স্ত্রী, কন্যা এবং তাঁর পুত্র সিফিয়ার (Siphir) শুকো দারার কাছে নতজানু হয়ে ঐ পাঠান প্রধান মালিকের কাছে না যেতে অনুনয় করেছিলেন। কিন্তু দারা এ কথা এ বিশ্বাস করেন নি যে, মালিক তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। ভয়ঙ্কর দুর্দশার মধ্য দিয়ে পথিমধ্যে তাঁর স্ত্রী নাদিরা আন্ত্রিক রোগে মৃত্যু বরণ করেন। স্বামীর প্রতি একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত অসুখী এই নারীর প্রাণ বিয়োগ

Scanned by CamScanner

হল এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর মরদেহ লাহোরে পাঠিয়ে দেওয়া হল কবরস্থ করার জন্য। আর বালুচির প্রধান দারাকে আশ্রয় দেওয়ার পরিবর্তে ঔরঙ্গজেবের সেনাপতিদের হস্তে তুলে দিলেন। এই চরম বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যান। পিতা পুত্র দু'জনকে ১৬৫৯ সালের ২৩শে আগষ্ট বন্দী করে দিল্লীতে আনা হয়।

আনন্দে আত্মহারা ঔরঙ্গজেব তাঁর ভিতরের অনুভূতি সুকৌশলে নিপুণভাবে গোপন রেখেছিলেন। সকলদিক থেকে যখন নিজেকে নিরাপদ বুঝলেন তখন ঔরঙ্গজেব দারাকে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন এবং তাঁর উপরে অকথ্য অত্যাচার ও অপমান করতে শুরু করলেন। দিল্লীর রাজপথ দিয়ে দারা ও তাঁর পুত্র সিফিয়ার সুকোকে একটি নোংরা হাতির পিঠে চড়িয়ে প্যারেড করালেন। প্রত্যক্ষদর্শী বার্ণিয়ার তার একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ দেন (Travel-Page 95-96)

"........ আমি সর্বত্র জনগণকে মর্মস্পর্শী ভাষায় দারার এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির জন্য ক্রন্দন ও অনুতাপ করতে দেখলাম। দিল্লির সবচেয়ে বড় বাজারের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ সুস্পষ্ট জায়গায় আমি অবস্থিত হলাম। একটি সুন্দর ঘোড়ার পিঠে আরোহন করেছিলাম। সঙ্গে ছিল দু'জন চাকর এবং দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। সমস্ত জায়গা থেকে আমি হৃদয়বিদারক ও ক্লেশকর আর্তনাদ শুনছিলাম। কারণ ভারতীয়রা অত্যন্ত কমল হৃদয়; নারী, পুরুষ এবং শিশুরা এমন বিলাপ করছিল যেন তাদের বিষম দুর্দৈব্য ঘটে গেছে। জিওনকান (মালিক জিওয়ান) চরম নিপীড়িত দারার কাছেই ঘোড়ায় চড়ে ছিলেন, এবং যে গালিগালাজ ও অপমানকর চিৎকার ধ্বনি তার প্রতি করছিল, এই বিশ্বাসঘাতক তাতে কোন মতেই কান দিচ্ছিল না।

আমি আরোও দেখলাম, কিছু ফকির ও গরীব মানুষেরা এই কুখ্যাত পাঠানটির দিকে পাথর ছুঁড়ে মারছে, কিন্তু কোন আন্দোলন হল না। তাদের প্রিয় এবং সহৃদয় রাজকুমারের মুক্তির উদ্দেশ্যে কেউ তাঁর অস্ত্র বের করতে চাইল না। দিল্লির প্রত্যেকটি অংশে এরূপ অপমানকর

Scanned by CamScanner

শোভাযাত্রার শেষে এই বেচারা বন্দীকে তাঁর নিজের এক বাগান হেইদার আবাদে (কাফি খান বলেন, 'খিজরাবাদ' —Travels Page 98-100) বন্দী করে আটকে রাখেন।

এক এক করে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ঔরঙ্গজেব। বন্দী দারার ভাগ্য নিয়ে একটি বড় দরবারে জনসমক্ষে বিচার শুরু হল। দানিশমন্দ খান সওয়াল করেন, মহৎ গুণের অধিকারী দারাকে মুক্তি দেওয়া হোক, কিন্তু শায়েস্তা খাঁ এবং অন্যান্য পারিষদবর্গ ঔরঙ্গজেবের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে দারাকে কাফির সাব্যস্ত করলেন। উলেমা তাঁকে বিধর্মী আখ্যা দিয়ে হত্যার বিধান দিলেন। দারার ক্ষমাপত্র বিবেচনা করে ঔরঙ্গজেব রায় দিলেন। যেহেতু তিনি একজন অন্যায্য দখলদার ও দুষ্কর্মের নায়ক তাই তার ক্ষমাপত্র বাতিল বলে গণ্য হল। বিশ্বাসঘাতক মালিক জিওয়ানের জীবন সংশয়াপন্ন হল। দিল্লীর রাস্তায় এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঙ্গা শুরু হল। তবু ঔরঙ্গজেব দমলেন না। এক ক্রীতদাস হৃদয়হীন দস্যু নাজর (Nazr)-কে দারা ও তাঁর পুত্র সিফিরার শুকোকে হত্যার দায়িত্ব দিলেন। কারাগারের এক ঘরে পিতাপুত্র একে অপরকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু নাজর, তাদের তলোয়ারের আঘাতে ছাড়িয়ে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যালীলা সম্পন্ন করলেন। বালিশের তলায় লুকানো একটি ছুরি বের করে আক্রমন করে দারা একাকী ব্যর্থ হন। ওই সব খুনী আততীয়দের আক্রমনের সামনে তাঁর কিছুই করার ছিল না। হত্যার পর কারাকক্ষটি নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

দারার ছেদিত মস্তক ঔরঙ্গজেবের সামনে নিয়ে আসা হলে তিনি তা সনাক্ত করে দারার শবদেহটি আবার দিল্লীর রাস্তায় প্যারেড করান, যাতে জনগণ নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন দারা আর ইহজগতে নেই। দিল্লীবাসীর মন ব্যথায় ভরে গেল। চরম হিংসাশ্রয়ী ঔরঙ্গজেব দারার মৃতদেহ হুমায়ুনের সমাধি স্থলে কবরস্থ করতে নির্দেশ দিলেন। জনগণ এতই রুষ্ট হয়েছিল যে তাদের রোশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঔরঙ্গজেব ভীত ও সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েন।

Scanned by CamScanner

দারা তার আর এক পুত্র সুলেমান শুকোকে পূর্বদিকে সুজার সঙ্গে মিলিত হতে পাঠান। কারার কাছে এসে তারা পিতার সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজয় ও দুরাবস্থার কথা জানতে পারেন। দ্রুত পিতার সঙ্গে মিলিত হতে তিনি ফেরার পথে রাজা জয় সিং-এর সাহায্য চান। জয় সিং তা প্রত্যাখান করেন। সুলেমান মোর্দাবাদ ও লখ্নৌ হয়ে হরিদ্বারে এসে পৌঁছান। পরিস্থিতি প্রতিকূল বুঝে লাদাকের দিকে পালাতে গেলে ধরা পড়েন। মির্জা রাজা জয় সিং-এর পুত্র রাম সিং সুলেমানকে শিকলে বেঁধে ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দের ২রা জানুয়ারীতে সেলিমগড় দুর্গে বন্দী রাখেন। পরে খোলা দরবারে ঔরঙ্গজেবের সামনে সুলেমান শুকোকে শিকলে বেঁধে হাজির করা হয়, রাজকুমার তাঁর পিতৃব্য ঔরঙ্গজেবের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেন, তাঁকে যেন একবারে হত্যা করেন, যেন স্লো পয়জন্ বা ধীরগতিসম্পন্ন বিষ প্রয়োগ করে তিলে তিলে হত্যা করা না হয়। ঔরঙ্গজেব তাঁর এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে খাবারের সাথে বিযাক্ত 'পোস্ত' মিশিয়ে খেতে দিতেন এবং তিলে তিলে অশেষ কষ্ট সহ্য করে মৃত্যু মুখে পতিত হন। এ এক বর্বরতার করুণ কাহিনী।

বাঁকি রইলেন সুজা, বাহাদুরপুর যুদ্ধের পর সুজা পাটনায় পালিয়ে যান। পাটনা থেকে মুঙ্গেরে চলে আসেন। কিন্তু সুলেমান শুকোর সঙ্গে ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে শান্তিচুক্তি অনুসারে সুজা বাংলা, উড়িষ্যা ও মুঙ্গেরের পূর্বদিকে বিহারের পূর্ণ অধিকার পেলেন। ঔরঙ্গজেব সুজার কাছে একটি হৃদ্যতাপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন এবং দারা শুকোর হাত থেকে মুক্তির পর তাঁকে তাঁর খুশী অনুসারে যে কোন কিছুই প্রদান করতে একান্তই ইচ্ছুক বলে জানান। কিন্তু সুজা ঔরঙ্গজেবকে চিনতে ভুল করেন নি ও তাঁর ফাঁদে পা না দিয়ে ১৬৫৯-এর জানুয়ারীতে উত্তর প্রদেশের ফতেহপুর জেলার খাজওয়া নামক স্থানে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন এবং প্রবল যুদ্ধের পর ঔরঙ্গজেবের সৈন্যদলের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে বাংলাতে পলায়ন করেন ও সেখান থেকে আরাকানে (বর্তমান মায়ানমার) পৌঁছান। আরাকানে তিনি মঘদের হাতে নিহত হন।

Scanned by CamScanner

[illegible] করবার চেষ্টা করার ফলে তাঁর এই পরিণতি ঘটে। ঔরঙ্গজেবের কাছে মুঘল [illegible] আর কোন দাবিদার রইল না। দারাশিকো, সিপাহশিকো ও নিজের ভ্রাতাদের হত্যালীলার মধ্য দিয়ে ঔরঙ্গজেব আলমগীর হিসাবে দিল্লী সিংহাসনে মহা সমারহে অধিষ্ঠিত হলেন।

ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চরিত্র মোটামুটি আদর্শজনক। তিনি অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ধর্মবিশ্বাসী ও নিয়মানুবর্তী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে অন্য সব মুঘলদের থেকে আলাদা। আত্মসংযমী, নেতৃত্ব দেওয়ায় পারদর্শী, দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন না। ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে বারানসীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি অনেক শত মন্দির ধ্বংস করেন।

ঔরঙ্গজেবের রাজপুত কন্যা রহমত্-উন্নিসা বা নবাব বাই (১৬২০-১৬৯১), দিলরাস বানু বেগম (১৬২২-১৬৫৭), উপপত্নী উদয়পুরি মহল (১৬৪০-১৭০৭) ও সহায়ক স্ত্রী ঔরঙ্গবাদি মহল (১৬৮৮) নামে মোট চারজন স্ত্রী নিয়ে তাঁর পারিবারিক জীবন।

ঔরঙ্গজেবের পুত্ররা হলেন—প্রথম বাহাদুর শাহ, মহম্মদ আজম শাহ, মহম্মদ আকবর, মহম্মদ কাম বক্স ও মহম্মদ সুলতান। এর মধ্যে মহম্মদ সুলতান তাঁর অবৈধ সন্তান তাঁর উপপত্নী উদয়পুরি মহলের গর্ভজাত।

বাহাদুর শাহ সপ্তম মুঘল সম্রাট, ১৭০৭ থেকে ১৭১২ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৭১২ সালে ২৭ ফ্রেব্রুয়ারীতে মারা যান। তাঁর পিতা তাঁকে অনেক বার কারা রুদ্ধ করেন।

জ্যেষ্ঠপুত্র আজম শাহ মাত্র চার মাস, ১৭০৭-এর ১৪ই মার্চ থেকে ৪ই জুন পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

মহম্মদ আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে, ঔরঙ্গজেব তাঁকে দমন করে কঠোর শাস্তির বিধান করেন। তিনি পিতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজপুতদের সঙ্গে মিলে ঘোষণা করেন, ঔরঙ্গজেব ইসলামিক ধর্মীয় কানুন লঙ্ঘন করে সিংহাসনে বসেন। তিনি নিজেকে

Scanned by CamScanner

সম্রাট ঘোষণা করে তাহাওয়ার খানকে তাঁর প্রধান কর্মচারী নিয়োগ করেন। পরে ব্যর্থ হয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে পালিয়ে পার্সিয়াতে নির্বাসনে যান, সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঔরঙ্গজেব তাঁর পুত্রদেরও বিশ্বাস করতেন না। তিনি তাঁর পুত্র সুলতানকে আমৃত্যু জেলে বন্দী রেখেছিলেন। অন্য এক পুত্র মুয়াজ্জমকে (Muazzam) আট বছর কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। তাঁর কন্যা জেব-উন্-নিসাকে সালিনগড় দুর্গে আমৃত্যু আটকে রেখেছিলেন। পিতাকে শেষদিন পর্যন্ত দুর্গে বন্দী রাখেন। তুচ্ছ ধর্মীয় কারণে একজন ইহুদী দার্শনিক সারমাদকে (ইনি পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন) হত্যা করেন।

১৭০৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী অসুস্থ ঔরঙ্গজেব সকালে নামাজ পাঠ শেষ করে জপমালার পুঁথি (beads of rosary) গুণতে গুণতে অচৈতন্য হয়ে পড়েন, শেষ পর্যন্ত সেই একই অদম্য ও নির্দয় হৃদয় নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর প্রার্থিত শুভদিন শুক্রবারে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর আগে তাঁর পুত্রদের যে উপদেশ দেন তা এইরূপ—

"নিজের পুত্রদের কখনও বিশ্বাস করবে না, কখনই সারাজীবন তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে ব্যবহার করবে না, কারণ, যদি সম্রাট শাহজাহান দারাকে এরূপ অন্তরঙ্গভাবে ব্যবহার না করতেন, তাহলে তাঁর কার্যনীতি ও কার্যধারা এরকম বেদনাদায়ক দশায় আসত না। সর্বদা মনে এই কথা মনে রাখবে যে 'রাজবাক্য বন্ধ্যা'—(The word of a king is barren).

দ্বিতীয় আকবরের পুত্র দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর (২৪ অক্টোবর ১৭৭৫—৭ নভেম্বর ১৮৬২) নামে মাত্র সম্রাট হন। তাঁর ক্ষমতা দিল্লীর (শাহজাহানাবাদ) মধ্যে সিমিত ছিল। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ সরকার দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করেন।

শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (যিনি জাফর হিসাবে পরিচিত) ১৮৬২ সালে বার্মার (বর্তমান মায়ানমারে) ব্রিটিশ কারাগারে মারা যান। ৩৩১ বছরের মুঘল সাম্রাজ্যের যবনিকাপাত হল।

Scanned by CamScanner

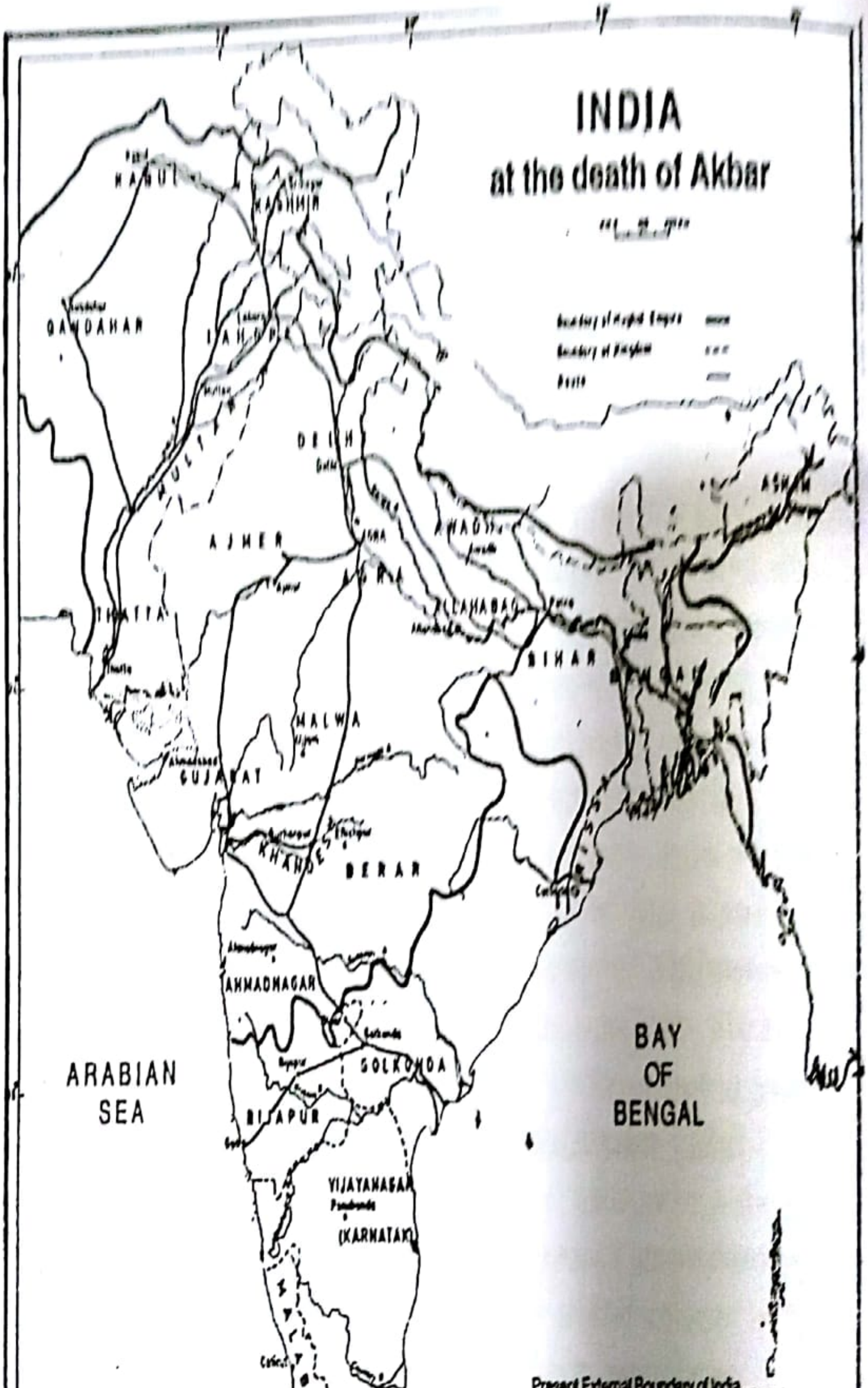
INDIA
at the death of Akbar
KASHMIR
QANDAHAR
LAHORE
MULTAN
DELHI
AJMER
AGRA
AWADH
ALLAHABAD
BIHAR
BENGAL
THATTA
MALWA
GUJARAT
KHANDESH
BERAR
AHMADNAGAR
GOLKONDA
BIJAPUR
VIJAYANAGAR
(KARNATAK)
MALABAR
ARABIAN SEA
BAY OF BENGAL
Present External Boundary of India

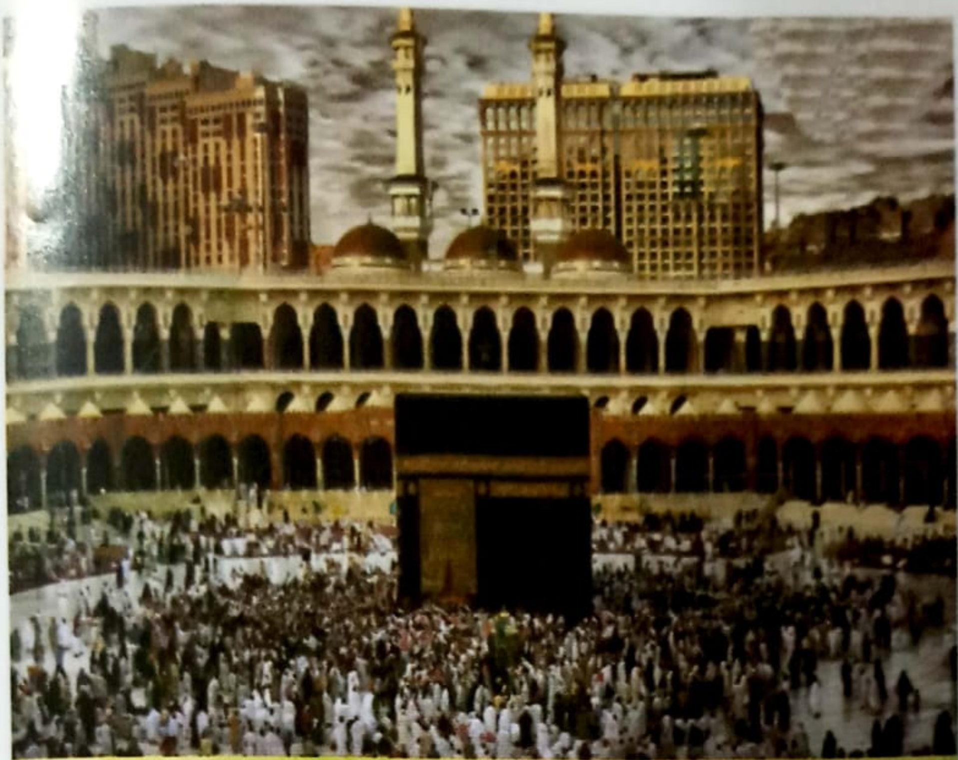

মক্কা শরিফ

সোমনাথ মন্দির

Scanned by CamScanner

রিজিয়া সুলতানা

রাণী পদ্মিনী

Scanned by CamScanner

কবীর

নানক

Scanned by CamScanner

সুলতানী আমলের মুদ্রা

মহম্মদ তুঘলকের মুদ্রা

স্বর্ণমুদ্রা

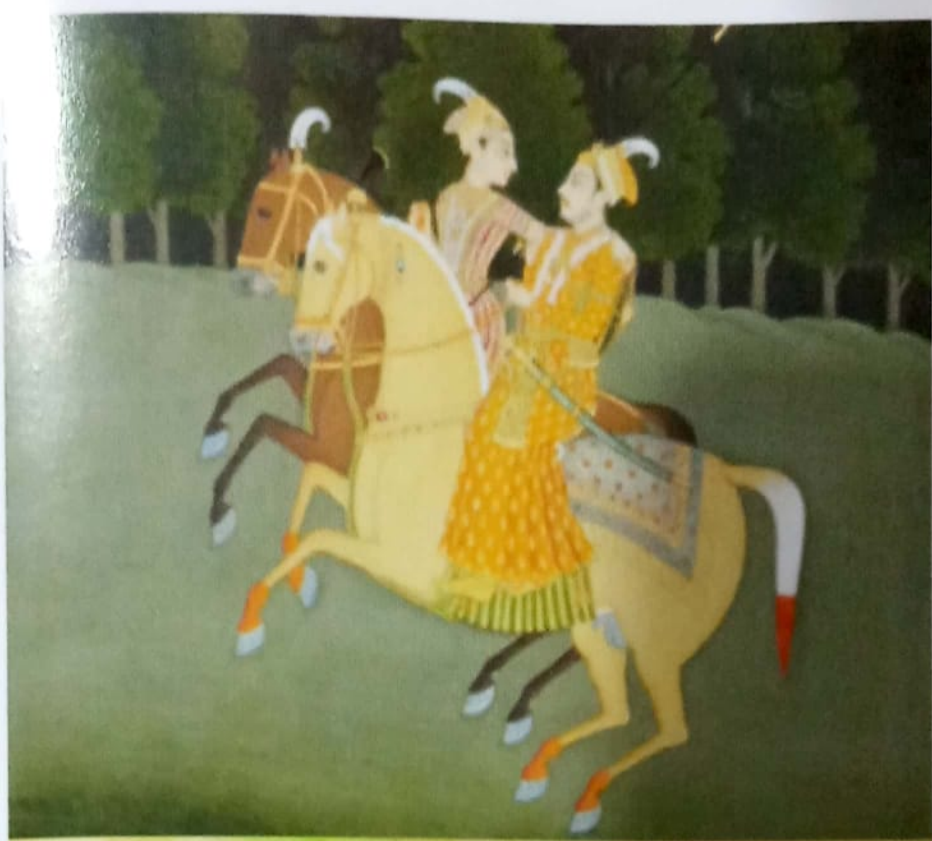

বজবাহাদুর ও রূপমতি

কোহিনুর

Scanned by CamScanner

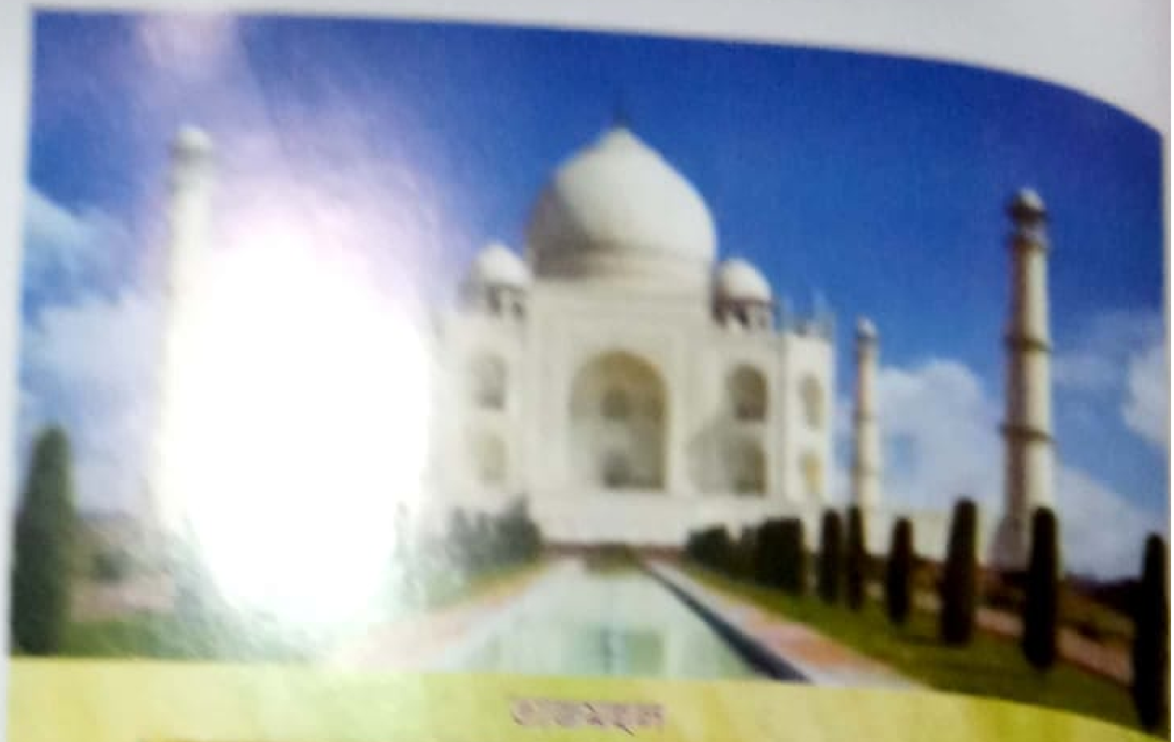

তাজমহল

ময়ূর সিংহাসন

Scanned by CamScanner

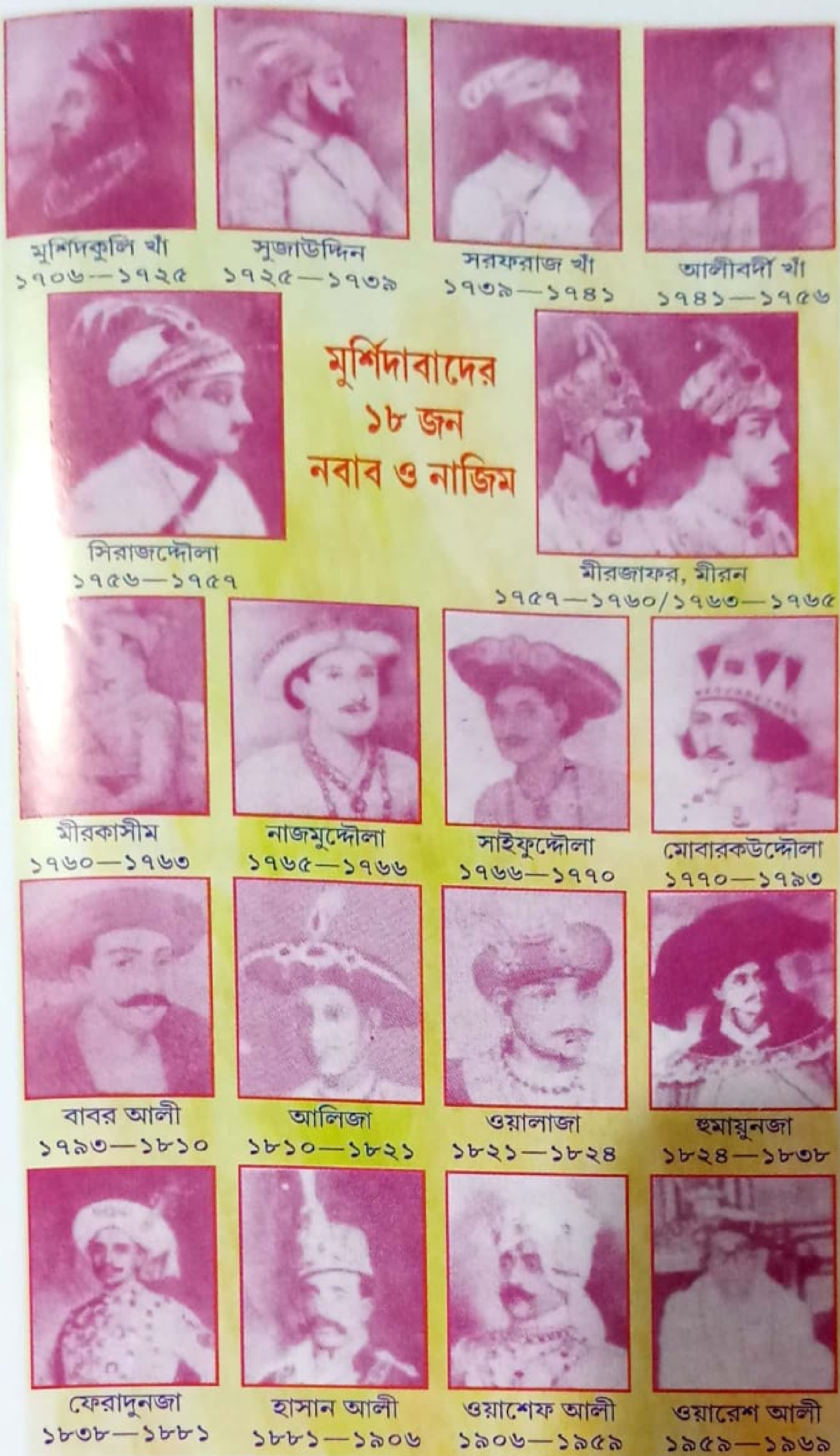

Scanned by CamScanner

হাজারদুয়ারী

ইমামবারা

কাটরা মসজিদ

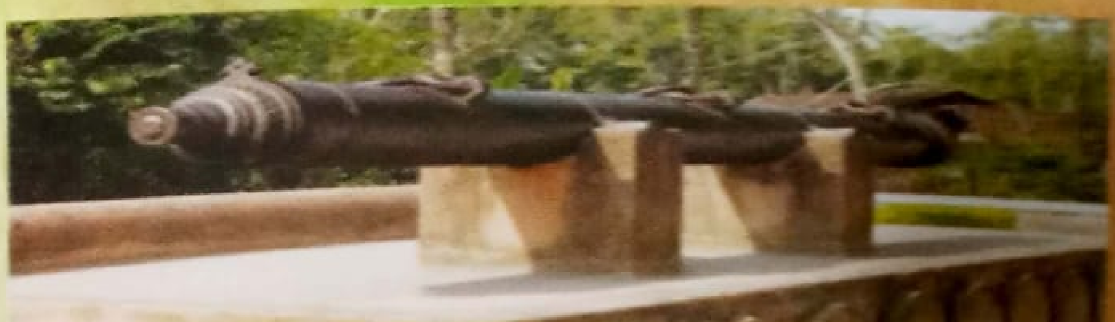

জাহানকোষা কামান

অষ্টম অধ্যায়

সিরাজউদ্দৌলা, উমদাতুন্নিসা, লুৎফুন্নেসা ও জগৎশেঠের কন্যা, টিপু সুলতান, সুন্দরী উন্নিচার্য ও দেওয়ান পূর্ণেয়ার কন্যা

অবিভক্ত বাংলার তথা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ নবাব সিরাজ-উদ্- দৌল্লাকে (১৭৩৩-১৭৫৭) 'ভাগ্যবান শিশু' (Fortune Child) বলা হত। আলিবর্দি খাঁ ১৭৪৬-এর আগষ্ট মাসে মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর দৌহিত্র সিরাজদৌল্লাকে অভিজাত সম্প্রদায়ের ইরিজখানের কন্যা উমদাতুন্নিসার (বহু বেগম) সঙ্গে অত্যন্ত জাঁকজমক ও মহাসমারোহের সাথে বিবাহ দেন। সিরাজের আর এক বেগম লুৎফুন্নেসা আলিবর্দি খাঁর হারেমে অসামান্য সুন্দরী ক্রীতদাসী ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লুৎফা সিরাজের পাশে থেকে তাঁকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে গেছেন। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মাত্র ১৫ বছর বয়সের সিরাজকে আলিবর্দি খাঁ তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণা করেন। বৃদ্ধ নবাব ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে মারা গেলে ঐ বছরে ২৩ বছরের তরুণ সিরাজ নবাব হন। আলিবর্দি খাঁ তাকে প্রজা বৎসল হওয়ার ও বর্হিশত্রুর দমনের পরামর্শ দিয়ে যান। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর লিউক এসক্রাফ্টন (Luke Scrafton) বর্ণনা দেন, সিরাজ মাতামহের মৃত্যুশয্যার পাশে বসে অঙ্গীকারে করেন তিনি ভবিষ্যতে কখনই উত্তেজক মদ্য বা পানীয় পান করবেন না। কিন্তু তিনি পরবর্তী কালে সুরাসক্ত ও ললনালোলুপ একটি লম্পটে পরিণত হন।

মুর্শিদাবাদের নবাবদের প্রথম পর্যায়ে মুর্শিদকুলি খাঁ, তারপর তাঁর জামতা সুজাউদ্দৌলা, তার পরে তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাব ছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ বুরহানপুরের দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বণিক হাজী ইসপাহন তাকে ক্রীতদাস হিসাবে ক্রয় করেন এবং তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়ে নাম রাখেন, মহম্মদ হাদী। তিনি দরবেশ হন।

ঔরঙ্গজেব মারাঠা যুদ্ধে কপর্দক শূন্য হয়ে পড়লে ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে হানী সম্রাটকে এক কোটি টাকা রাজস্ব পাঠান। তাঁরই দানস্বরূপ সম্রাট তাঁকে "পরিত্রাতা দেবদূত" এবং মুর্শীদকুলী খান উপাধি প্রদান করেন। 'মুর্শিদ' শব্দার্থে শিষ্য, 'কুলী' অর্থে ভৃত্য এবং খাঁ অর্থে আমীর। তাঁর নামানুসারে মুর্শিদাবাদ নাম প্রবর্তিত হয়। ঢাকায় (মুসলমান আমলে নাম ছিল জাহাঙ্গীর নগর) অন্য সুবেদারদের সঙ্গে বিবাদ বশতঃ মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ববিভাগের কর্মচারী বৃন্দ সহ মুর্শিদাবাদে তাঁর দেওয়ানী দপ্তর স্থানান্তরিত করেন। তিনি বাদশাহ ফারুক শরিয়ারের কাছ থেকে ঢাকার ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মানিকচাঁদকে শেঠ উপাধি (শেঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) আনিয়ে দেন। শেঠজী মুর্শিদকুলী খাঁকে অর্থ সাহায্য করতেন এবং অন্যান্য কারবারী ইংরেজ ও ফরাসী, দেশীয় জমিদার, মহাজন ও বণিকরা ঋণ হিসাবে অর্থ সাহায্য নিতেন। মানিকচাঁদের ভাগীনেয় তথা পোষ্যপুত্র ফতেচাঁদ সর্বপ্রথম জগৎশেঠ (জগৎশ্রেষ্ঠ) উপাধি পান। শেঠদের গদিতে প্রতিদিনই কোটি কোটি টাকার কারবার চলত।

এই পর্যায়ের তিনজন নবাবের শেষ জন সরফরাজ খাঁ ছিলেন অলস, বিলাসপরায়ণ, নারলোলুপ ও লম্পট। তাঁর হারেমে পনের শত বেগম ও মসজিদে একশত বেতনভোগী মোল্লা থাকত। তাঁর একজন বিশ্বস্ত উজীর আতাউল্লা খাঁর বিবাহিতা ভাতুষ্পুত্রী পরমা সুন্দরী ছিলেন। আতাউল্লা এই পরমাকে চেহেলসেতুন মহলে ডেকে পাঠান ও জোর পূর্বক তার ঘোমটা খুলে শ্লীলতাহানি করেন। কিন্তু মহিলাটি লজ্জায় বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। তিনি এত বড় লম্পট ছিলেন যে তাঁদের সচিব ধনকুবের ফতেচাঁদের অলোকসামান্য রূপলাবন্যবতী পুত্রবধূকে একবার দেখতে চাইলেন। ফতেচাঁদ ভয়ে একদিন সন্ধ্যায় ক্ষণকালের নিমিত্ত পুত্রবধূকে নবাবের প্রাসাদে পাঠাতে বাধ্য হলেন। নবাব তাঁর ধর্মনিষ্ঠ করেন নাই। কিন্তু তাঁকে প্রাণভরে অবলোকন করেন। ইহাতে ফতেচাঁদ অপমানিত ও রুষ্ট হন।

ফতেচাঁদ আলিবর্দি খাঁর সহিত মিলিত হয়ে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিল গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে আলিবর্দি খাঁকে সিংহাসনে বসালেন। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে নাগপুরের মারাঠা রাজা রঘুজী

Scanned by CamScanner

ভোঁসলের দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে জগৎশেঠের আড়াই কোটি টাকা লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুইপুত্র দয়াচাঁদ ও আনন্দচাঁদ। দয়াচাঁদের পুত্র স্বরূপচাঁদ মহারাজ উপাধি পান। আনন্দচাঁদের পুত্র মহতাব রায় জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। এই জগৎশেঠকেই সিরাজউদ্দৌলা নিজ দরবারে প্রকাশ্যে চপেটাঘাত করেন।

আলীবর্দ্দি খাঁ একে একে সরফরাজ ও মারাঠা দূত ভাস্কর পণ্ডিতকে বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্বক নিহত করে মুর্শিদাবাদের মসনদ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজকোষ থেকে ৭০ লক্ষ টাকা এবং পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের মূল্যবান রত্নাদি হীরা, জহরৎ, মুনি, মুক্তা সোনা ও চাঁদি ইত্যাদির অধিকারী হন। আলীবর্দ্দি খাঁ ছিলেন অপুত্রক তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন পারস্য দেশের খোরসান নামক দেশের অধিবাসী। পিতা ছিলেন সম্রাট ঔরঙ্গজেবেরে পুত্র আজমশাহের একজন প্রিয় বাবুর্চি। তাঁর তিন কন্যা ঘসেটি বেগম, মোমীনা বেগম ও আমীনা বেগম। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিন বেগমই বিধবা হন। ঘসেটি বেগম ছিলেন বন্ধ্যা আরা মোমীনা বেগমের (শাহ বেগম) পুত্র ছিলেন পূর্ণিয়ার সৌকতজঙ্গ। আমীনা বেগমের গর্ভজাত সন্তান সিরাজউদ্দৌলাকে আলিবর্দি খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদে বসান। আলীবর্দ্দি খাঁর সময় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে নবাবী শুরু।

আলীবর্দ্দি খাঁ ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের কাশিম বাজারের কুঠি আক্রমন করেন। ইংরেজ বণিকগণ জগৎ শেঠের নিকট থেকে ১২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে নবাবকে প্রদান করে অব্যাহতি পান। তদবধি ইংরেজরা সময়ে সময়ে জগৎশেঠের নিকট অনেক উপকার প্রাপ্ত হন। এই মহতাব রায় বা জগৎশেঠই ইংরেজদিগের ভারত সাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করিয়ে দেন।

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে আলীবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হলে সিরাউদ্দৌলা নবাব হন। ইহার কিছু দিন পরে বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর সিরাজের উপর রুদ্ধ হন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সৈকত খাঁ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। সেনাপতি মিরজাফরকে ইঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত করা হয়। এই দুঃসময়ে জগৎশেঠ মহতাব রায়ের কাছে সিরাজ তিন কোটি টাকা চেয়ে বসেন। জগৎশেঠ

Scanned by CamScanner

আপত্তি করলে সিরাজ জগৎ শেঠের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করে বন্দী করেন। জগৎশেঠের বংশীয়রা দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে নবাবীর সনদ আনিয়ে দিতেন। কিন্তু মহতাব রায় সিরাজের জন্য সনদ এনে দেন নি। অথচ তিনি পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সৌকতজঙ্গের নামে সনদ আনাবার চেষ্টা করছিলেন। ইহাতেও সিরাজ, জগৎ শেঠের উপর ক্রোধান্বিত ছিলেন। অতঃপর অতিকষ্টে মুক্তিলাভ করে তিনি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করবার সুযোগ খুঁজছিলেন। এই সময় অপর এক ঘটনায় জগৎশেঠ আরোও চটে গেলেন কথিত আছে যে, অসামান্যা নামে জগৎ শেঠের, এক অনুপম রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল, তেমন সুন্দরী বাঙ্গলায় নাকি আর ছিল না, তাঁর উপর বিলাসব্যসনাসক্ত সিরাজের কুদৃষ্টি পড়ে। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ ধনকুবের জগৎশেঠের দুহিতাকে করায়ত্ত করা সহজসাধ্য নয় দেখে কৌশল জাল বিস্তার করলেন। একদিন সন্ধ্যার পর সিরাজ রূপতৃষ্ণার মোহে অসামান্যাকে দেখে নয়নের সার্থকতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বেগমের বেশে জগৎশেঠের গৃহমধ্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর কৌশলে শেঠ তনয়াকে এক নিভৃতকক্ষে আনালেন। কিন্তু যা দেখলেন তাতে তাঁর মাথা ঘুরে গেল। তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ফলাফলের বিষয় চিন্তা হারিয়ে আলিঙ্গন মানসে সুন্দরীর অঙ্গ স্পর্শ করলেন। শেঠ দুহিতার তখন আর বুঝতে বাকি রইল না। তিনি ত্রস্ত হয়ে দ্রুতপদে তথা হতে পলায়ন পূর্বক সাশ্রুনয়নে স্বামীর নিকট সকল কথা ব্যক্ত করলেন। শ্রবণমাত্র শেঠ জামাতা শার্দুলবৎ গর্জন করতে করতে দ্রুত গৃহ হতে বর্হিগত হলেন। সিরাজ সেই সপ্তমহল বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠীপ্রাসাদ অতিক্রম করে প্রস্থান করবার পূর্বেই তাঁকে ধরে শতাধিকবার চর্মপাদুকা প্রহারে ও ঘন ঘন মুষ্টি এবং চপেটাঘাতে কোমলকায় নবাবের প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রেখে ছেড়ে দিলেন। তার এই যৌন কেলেঙ্কারীর সংবাদ রাজ প্রাসাদে ছড়িয়ে পড়ল। এই মর্মস্পর্শী দুঃসহ যাতনা ও নিদারুণ অবমাননার কথা সিরাজের হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ শেলবৎ আমূল বিদ্ধ হতে থাকল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে শেঠজামাতা রাজপথ দিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে একজন যবনসেনা হঠাৎ এসে প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের সম্মুখে তাঁর মস্তক স্কন্ধচ্যুত করে ফেলেন। ভয়ে

Scanned by CamScanner

সকল লোক পলায়ন করল। অতঃপর সেই ছেদিত মস্তক রৌপ্যথালে রক্ষিত ও বহুমূল্য রুমালে আচ্ছাদিত করে শেঠ দুহিতার সমীপে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরিত করেন। জগৎ শেঠ মহতাব রায় আর ধৈর্য্য রাখতে পারলেন না, এভাবে সিরজা একে একে অনেককে চটালেন। প্রকাশ্য রাজপথে হুসেন কুলী খাঁকে হত্যা করেন। নবাব হওয়া মাত্র মাতৃস্বসা (খালা) ঘসেটি বেগমকে নজরবন্দী করে রাখেন। তাঁর প্রচুর ধনরত্ন ও অর্থ অপহরণ করেন। এমনকি রাজবল্লভকে তহবিল তছরূপের দায়ে বন্দী করেন। বিদেশী মোহনলাল কাশ্মীরীকে প্রধান মন্ত্রী পদে ও মীরমদনকে মীরজাফরের স্থলে প্রধান বক্সী পদে নিযুক্ত করে পুরাতন দরবারীদের কাছে নির্বান্ধব হন। তাছাড়া তাঁর গুপ্তচর বিভাগও ভেঙে পড়ে।

ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণ, শত্রুদের প্রশ্রয় দান, কোম্পানীর কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচার দস্তক ব্যবহার ইত্যাদিতে সিরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমন করে তাদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীকে ২৪´ X ১৮´ একটি বদ্ধ কারাগারে রাখার ফলে ১২৩ জন মারা যান, যা অন্দকূপ হত্যা (Black Hole Tragedy) নামে পরিচিত। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকরা দ্বিমত পোষণ করেন।

কাশিম বাজারে জগৎ শেঠের বাড়ীতে পত্র দ্বার নিমন্ত্রিত ক্লাইভের উপস্থিতিতে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার চক্রান্ত হয়। জগৎশেঠই প্রস্তাব দেন। বক্সী ও সেনাপতি মীরজাফর সমর্থন করেন। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ও কলকাতার সন্নিকট হালসিবাগান নিবাসী উর্মিচাঁদ বা আমীন চাঁদ মন্ত্রণায় যুক্ত ছিলেন। চব্বিশ বছর বয়সী নবাব সিরাজ তাঁর পতনের জন্য সর্বাধিক দায়ী। কিন্তু এদের বিশ্বাসঘাতকতা সিরাজের পতন অনিবার্য করে তোলে। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ জুন মুর্শিদাবাদের পলাশীর প্রান্তরে সিরাজের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত। সুতরাং পলাশীর বিজয়ী ক্লাইভই প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

মিরমদন ইংরেজ গোলার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হলে নবাব

Scanned by CamScanner

সিরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে উদাসীন মিরজাফরকে বারংবার পাগড়ী খুলে তাঁকে স্বদেশ রক্ষার্থে অনুনয় বিনয় করলেও তাঁকে টলাতে পারলেন না। মিরজাফর বললেন, "অদ্যকার মত যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকুক। আগামীকাল ইংরেজদের সকলকে তাড়াইয়া দিলেই চলিবে।" এই চাটুবাক্যে সিরাজ সেনাদের যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিলে, সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, আর সেই সুযোগে ক্লাইভের সেনাদলের আক্রমণে অনায়াসে ক্লাইভ জয়লাভ করেন। মিরজাফর যুদ্ধ চলাকালীন এক প্রান্তরে সেনাদলকে কোন নির্দেশ না দিয়ে চুপচাপ দণ্ডায়মান হয়ে থাকলেন। বিশ্বাসঘাতকতা ও সিরাজের অপরিণাম দর্শীতার ফল স্বরূপ বাঙলার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে এল। বাঙলার সৌভাগ্য লক্ষ্মী চিরতরে অস্তমিত হয়ে গেল। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে The Company of Merchants of London Trading into East Indies তথা The East India Company প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে কোম্পানীর ক্ষমতা দখল। ১৮৫৭ তে সিপাহী বিদ্রোহ। ১৮৫৮ তে ব্রিটিশের ক্ষমতা দখল। ১৮৭৪ এ আইনত কোম্পানী ভঙ্গ।

সিরাজের পরে ষষ্ঠ ও সপ্তম নবাব মীরজাফর ও তাঁর পুত্র মীরন। তারপরে অষ্টাদশতম নবাব ওয়ারেশ আলী (১৯৫৯-১৯৬৯) নবাব ওয়াশেফ আলির পুত্র। স্যার ওয়াশেফ আলীর কনিষ্ঠ সন্তান সৈয়দ সাজেদ আলি মির্জ্জা কলকাতায় বসবাস করেন। ওয়াসেফ আলির চতুর্থপুত্র সৈয়দ কাজেম আলী মীর্জ্জা ভারতীয় কংগ্রেসের সদস্য ও একদা পশ্চিমবঙ্গ সরকারে কুটির শিল্পবিভাগের সহকারী মন্ত্রীপদ অলংকৃত করেছিলেন। বংশধরদের অনেকে বিদেশে বসবাস করেন।

এককালে বৈভবে মুর্শিদাবাদ লণ্ডনের চাইতে অনেক বেশী ছিল। লর্ড ক্লাইভ ও লর্ড কার্জন নবাবী পশুশালা দেখে নবাবী প্রাসাদ মনে করে ভুল করেন। আজ সবই স্তমিত, নবাবদের বংশধরদের অনেকেই এখন শ্রমিক, কৃষক ও গরীব মানুষে পরিণত। ভারত সরকার একজন সচিবকে নবাবদের স্মৃতিসৌধগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরজমিনে পরিদর্শনার্থে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এমনই যে বেশীরভাগ জায়গা বেদখল হয়ে

মুর্শিদাবাদের নবাবদের ক্রম পর্যায়

প্রথম পর্যায়

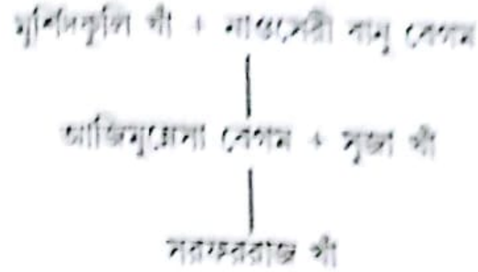

দ্বিতীয় পর্যায়

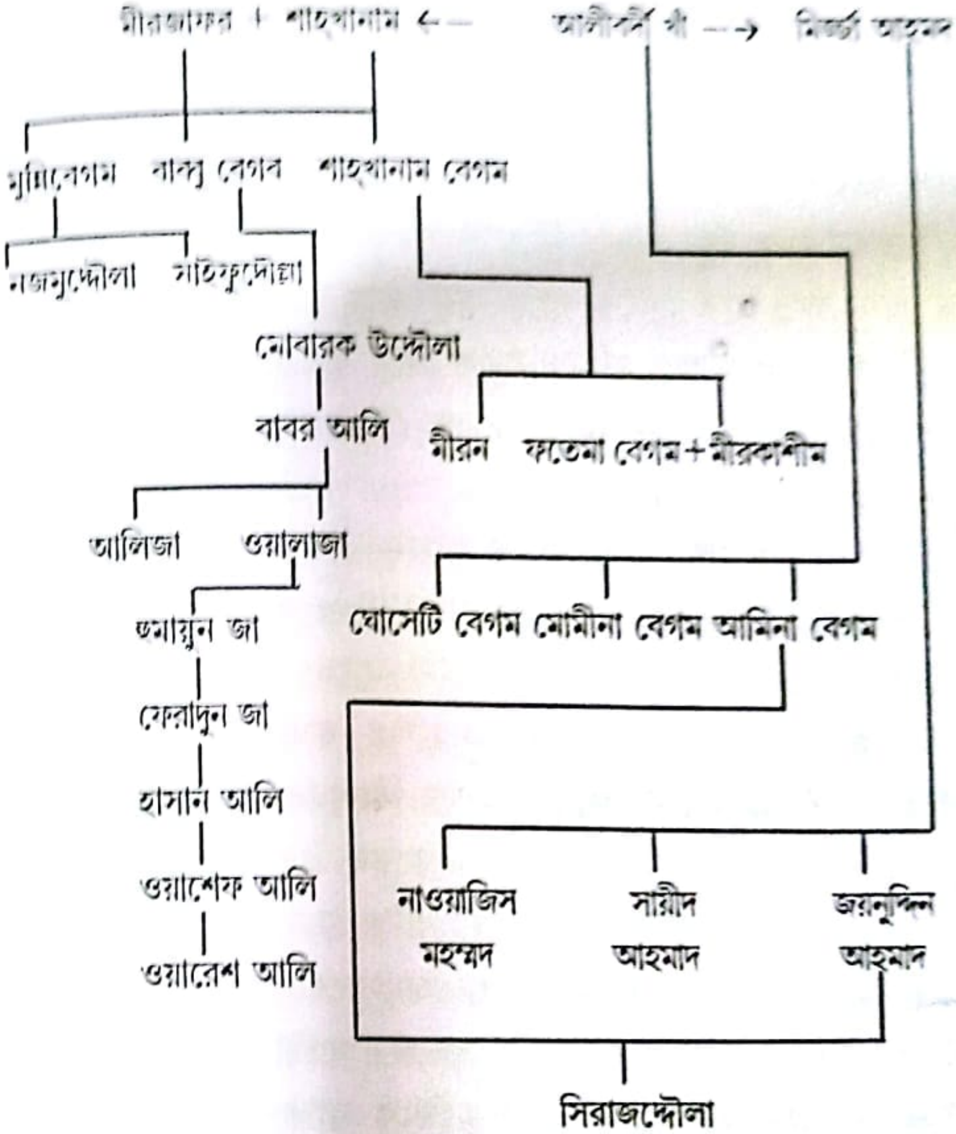

রয়েছে যা দখলমুক্ত করা প্রায় অসম্ভব। সংস্কারের জন্য প্রায় একশত কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। কিন্তু তা কাজে লাগান যায় নি। হাজার দুয়ারীর মত কয়েকটি জায়গা সংস্কার ও পুর্ণগঠিত হয়।

রবার্ট ক্লাইভ ভারতবর্ষ থেকে এত বিপুল সম্পদ লুঠ করে ছিলেন যে, তিনি এখান থেকে ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে জীবন বাঁচান। সেখানে বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। ক্লাইভ শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করেন।

টিপু সুলতান

হায়দার আলি এবং ফতিমা ফকর-উন্-নিসার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান ফতেহা আলি সাহাব টিপুর (২০ নভেম্বর ১৭৫০-৪ মে ১৭৯৯) স্থানীয় এক পারিবারিক সন্তের নাম অনুসারে নাম রাখা হয়।

ফ্রন্সের প্রধান সেনানায়ক থাকাকালীন নেপোলিয়ান (যিনি পরে সম্রাট হন) টিপুর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা চালান। তিনি একজন ক্ষমতাশালী শাসক হিসাবে পরিচিত হন।

একজন ফ্রান্স বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে শিকার করতে গিয়ে বাঘের কবলে পড়ে যান। অস্ত্র হাত থেকে পড়ে যায়। বাঘ তার উপরে লাফিয়ে পড়তেই লাফ মেরে অস্ত্র কুড়িয়ে হাতে নিয়ে বাঘটিকে আক্রমণ করে মেরে ফেলেন বলেই তাকে মহীশূরের বাঘ (The Tiger of Mysore) আখ্যা দেওয়া হয়।

টিপু অসংখ্য হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন। বহু জায়গায় ধ্বংসস্তুপ সরিয়ে মসজিদ নির্মান করেন। ঐতিহাসি Willam Logan-এর লেখা 'Malabar Manual'-এ এসব ঘটনার বর্ণনা আছে। এর মধ্যে চিরাক্কাল তালুকের থালিপ্পারাম্পু এবং থ্রিচম্বরম মন্দির, বাদাকারার পোনমেরি মন্দির এবং তেলিচেরির থিরুবাঙ্গাতু মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন এবং ধূলিস্যাৎ করেন। ইসলামীয় নৃশংসতায় টিপু চরম পর্যায়ে চলে যান। ম্যাঙ্গলোরের বৃটিশ সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান কলোনেল ফুলার্টনের প্রতিবেদন অনুসারে, ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে পলঘাট দুর্গ দখলের সময় ঘৃণ্যতম এবং সবচেয়ে যতটা সম্ভব নৃশংসতার ও বর্ণাতীত অত্যাচারের দ্বারা যত সংখ্যক ব্রাহ্মণ সম্ভব তাদের

হত্যালীলা সম্পন্ন করেন এবং তাদের দেহ থেকে বিচ্ছন্ন মুণ্ডুগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে দর্শনের বন্দ্যোব্যবস্থা করেন, যাতে আর কোন ব্রাহ্মণ বিরোধীতা করতে বিন্দুমাত্র সাহস না করেন। জামোরিন দুর্গ থেকেও নিরহ ব্রাহ্মণদেরও নির্মমভাবে হত্যা করা হয় ও ছিন্নমস্তক প্রদর্শিত হয়। এত ব্রাহ্মণ হত্যা করেন, যা ব্রাহ্মণদের পৈতে গুণে নির্ধারন করতে হয়। প্রায় লক্ষাধিক ব্রাহ্মণকে তিনি হত্যা করেন। তাঁর এই নির্মম অত্যাচারের কথা আজও মানুষেরা হজম করতে পারে নি। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার আশঙ্কায় ৩০০০ ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করে।

টিপু সুলতান এবং তাঁর পিতা হায়দার আলি প্রথম রকেট তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন। এই প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে ফ্রান্স রকেট নির্মান করেন। কিন্তু অস্ত্র প্রক্ষেপনের জন্য টিপুর নির্মিত রকেট ফ্রান্সের নির্মিত রকেট অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। ফলে টিপু একজন শক্তিশালী শাসক হিসাবে ঐ আমালে বিশ্বজোড়া পরিচিতি লাভ করেন। দ্বিতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধে এই রকেট ব্যবহারে প্রভূত সাফল্য লাভ করেন ও বৃটিশকে পরাস্ত করেন।

টিপুর মৃত্যুর পরে ব্রিটিশ বাহিনী টিপুর তলোয়ার এবং তাঁর হাতের অঙ্গুরীয় যুদ্ধজয়ের ট্রফি হিসাবে নিয়ে নেন, তবে এটি বিস্ময়ের যে এই অঙ্গুরীয়তে লেখা ছিল "রাম", যদিও তিনি হিন্দুদের ও হিন্দুধর্মকে ঘৃণা করতেন। ব্রিটিশ যাদুঘরে এগুলি ২০০৪ সাল অবধি প্রদর্শিত হত। ২০০৪ সালে বৃহৎ ব্যবসায়ী কিংফিসারের মালিক বিজয় মাল্য নিলামে টিপুর তলোয়ার ক্রয় করেন। আবার এই টিপুই ১৫৬টি হিন্দু মন্দিরের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রদান করতেন।

টিপু সম্রাট হওয়ার বাসনায় ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তাঁরা তাঁকে কিছু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া করলে তিনি পাদিশাহ এবং ভারতের শাসন কর্তা হবেন বলে বিধান দেওয়াতে তিনি আরোও অগ্রহান্বিত হন। ২০টি যুদ্ধজাহাজ, ৭২টি কামান, আরো ৬২টি কামানের ফ্রিগেট নিয়ে বিশাল নৌবাহিনী বানান, অধিকাংশ জায়গায় নাম পরিবর্তন করে মুসলিম নাম রাখেন, টিপুর মৃত্যুর পর সমস্ত জায়গার

Scanned by CamScanner

নাম আবার আগের নামে পরিবর্তিত হয়। ব্রাহ্মণদের ঘৃণা, তাঁদের উপরে চরম অত্যাচার করতেন, অথচ তাঁদের কাছে জ্যোতিষী বিধান নিয়েছেন।

উন্নিযার্চ ছিলেন একজন জনপ্রিয় বিখ্যাত মহিলা যোদ্ধা। তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করে টিপু তাঁকে আটক করে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে মহীশূরে নিয়ে আসেন এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করেন। আরোও অনেক বেগম থাকা সত্ত্বেও টিপু তাঁর যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্যই তাঁকে অন্দরমহলে বেগম হিসাবে থাকতে বাধ্য করেন।

টিপু তাঁর ব্রাহ্মণে দেওয়ান পূর্ণেয়া পণ্ডিতকে খোঁজ নিতে দেওয়ানের বাড়ীতে আসেন। দেওয়ান বাড়ীতে না থাকায় তাঁর পরমা সুন্দরী কন্যা তাঁকে অতিথি আপ্যায়ন করেন। তাঁর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তাঁকে একাকী পেয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জবরদস্তী জড়িয়ে ধরেন ও শ্লীলতা হানি করে বর্ষণের চেষ্টা করেন। এমন সময় নায়েব উপস্থিত হয়ে বিশদে সব জানতে পারেন। নায়েব ঐ মুহূর্তে কিছু না বলে শান্ত থেকে টিপুর পতনের পরিকল্পনা তৈরি করেন। এমন কি টিপুর কতিপয় সৈন্য দেওয়ানের এই সুন্দরী কন্যা যখন কাবেরী নদীতে আনুষ্ঠানিক পবিত্র স্নানের জন্য যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে।

টিপুর নিয়ন্ত্রনহীন যৌনলালসা, বহু নারী ধর্ষণের ঘটনা এবং ব্রাহ্মণদের উপর অবাধ অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের জন্য তিনি কুখ্যাত ও অনেকের কাছেই নিন্দনীয় হয়ে আছেন অথচ এই টিপুই কর্ণাটকের লক্ষ্মীকান্ত মন্দিরে চারটি রৌপ্য নির্মিত পেয়ালা দান করেন। এই মন্দিরে প্রতিদিন টিপুর নামে পূজা দেওয়া হয়। টিপু শ্রীঙ্গেরী মঠ নির্মাণ করেন।

১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ সুরু হয়। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে টিপু চরম ভাবে পরাস্ত করেন। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিরাজ-উদ্-দৌল্লা যেখানে তাঁর মাত্র এক বছর শাসনকালে পলাশীর প্রান্তরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত ঘটান, সেখানে টিপু সুলতান তার সাতাশ বছর পরে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর তথা ইংরেজদের পরাস্ত

করে ভারতে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেন। তিনি শক্ত হাতে ইংরেজদের শুধু দমন করেন নি, নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সতের বছর (১৭৮২-১৭৯৯) ধরে মহীশূরের শাসনকর্তা ছিলেন।

ওটোম্যান সুলতান আব্দুল হামিদের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইস্তাম্বুলের শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু ওটোম্যানরা (Ottoman) একটি বৃহৎ যুদ্ধ জয় ও অপর একটি যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় সাহায্য করতে পারেন নি।

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে মর্নিংটোনের স্যার রিচার্ড ওয়েলেসলির নেতৃত্বে পরিচালিত বৃটিশ সেনাবাহিনীর কাছে পরাস্ত হন। বিশালাকায় বাহিনী মহীশূরের রাজধানী শেরিঙ্গ পতম নগবীর দেওয়াল ভেঙে রাজধানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। টিপু নগরপ্রাচীর রক্ষা করতে প্রাণপন যুদ্ধ করেন। কিন্তু বৃটিশ বাহিনী তাঁকে এখানে বধ করেন। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে ৪ঠা মে মহীশূর ইংরেজদের হাতে চলে গেল এবং বীর যোদ্ধা টিপুর পতন ঘটল। মিশ্র চরিত্রের রাজা টিপুকে নিয়ে আজও নানা ইতিহাস ও নানা কাহিনী প্রচলিত।

ইতিহাসের পাতায় নরহত্যা ও ধর্ষণ একটি সাধারণ আলোচ্য বিষয়। প্রাচীন যুগ থেকে এসবের গোড়াপত্তন। বার-তের বছরের রোমকন্যা আগনেস (Agnes) ই পৃথিবীর প্রথম ধর্ষিতা মহিলা। আগনেস খ্রীস্টের কাছে নিজেকে নিবেদন করে ও ধর্মমত গ্রহণ করে পবিত্র হন। তাঁর এই পবিত্রকরণের পরে তাঁকে পতিতালয়ে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে এর বর্ণনা আছে। খ্রীস্টান ধর্ম নেতা জিউস অ্যানিটোপ ও ইউরোপাকে ধর্ষণ করেন। ইউরোপাকে জিউস ষাঁড়ের ভঙ্গিমায় ও লেডাকে হাঁসের ভঙ্গিমায় ধর্ষণ করেন। জিউস তাঁর বোন হেরাকে ধর্ষণ করেন। হেরা লজ্জা নিবারনের জন্য ভাইকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। "দ্যা রেপ্ এব্ প্রোজারপাইন"—একটি রোমের পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানা যায় পার্সিফোনিকে হাদেস ধর্ষণ করেন। দেবী ক্যালিপসো অডিসাসকে ধর্ষণ করেন। প্রাচীন ভারতে উর্বশী মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, হেমা, পুঞ্জিকাস্থলা ও সোমা নাম্নী

প্রভৃতি ৪২ জন গণিকার কথা উল্লেক আছে। আর আছে বহু অত্যাচারের কাহিনী।

সমস্ত ধর্ষণের ইতিহাসে মধ্যযুগের বর্বরতা চরম পর্যায়ে যায়। দেশের এমন কোন আইন ছিল না যা মহিলাদের রক্ষা করতে পারে। স্বাধীনতার আগে ও পরে অনেক মনীষিরা নারীর অধিকার রক্ষার্থে অনেক আন্দোলন করে গেছেন। অনেক আইন প্রণয়ন হয়েছে, তবুও নারীর প্রতি অত্যাচার থেমে থাকে নি। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মহিলারা এগিয়ে আসলেই এর অনেকখানি অবসান ঘটবে। আজ আমরা তা সমাজের নানা ক্ষেত্রে উপলব্ধি করতে পারছি। নারী পুরুষ ও উঁচু-নীচু ভেদাভেদহীন, মানুষে মানুষে ভালবাসা ও সৌভ্রাতৃত্বে পূর্ণ সমাজ গঠনে সকলের অগ্রণী ভূমিকা একান্তই জরুরী। মধ্যযুগের শাসক ও শক্তিমানরা নির্বিচারে বাধাহীনভাবে নরহত্যা ও ধর্ষণের মত যে রূপ নৃশংস, জঘন্য ও বর্বর আচরণ করেছে আজকের যুগের নিরিখে তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। কোন সুসভ্য মনুষ্য ইতিহাসে এর কোন ক্ষমা নেই। যে সব ঐতিহাসিক এঁদেরকে মহান করে দেখিয়েছেন, তাঁরা দেশের মানুষকে ভুল তথ্য পরিবেশন করে চরম বিভ্রান্ত করেছেন। এখন গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় মানুষ সুশিক্ষিত হয়ে বিচার করে সঠিক মতাদর্শের উপর দাঁড়িয়ে সত্য উদ্ঘাটিত করছেন, তাতে আপামর জনগণের ও সমাজের কল্যান বই ক্ষতি কিছু নেই। সর্বশেষে, সত্যকে কখনই চাপা দেওয়া যায় না। সত্য একদিন উদ্ঘাটিত হবেই। যে সব রাষ্ট্রনেতারা ভাবছেন, মিথ্যার বন্যা বয়ে দিয়ে দেশবাসীকে বিপথে চালিত করা সম্ভব তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

Scanned by CamScanner

তথ্যগত গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. আবুল ফজল—আকবর নামা।
২. আব্দুল রজ্জাক—মতলাউস সাদেইন, ইলিয়ট IV (অনুবাদ-সাচাউ)।
৩. আল-বেরুনী—কুতুব-উল্-হিন্দ, তাহকিক-ই-হিন্দ।
৪. ঈশ্বরী প্রসাদ—এ শর্ট হিস্টোরি অব মুসলিম রুল।
৫. উইলিয়াম লোগান—মালাবার ম্যানুয়াল।
৬. এলিয়ট ও ডাউসন্—দি হিস্টোরি অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইট্স ওন হিস্টোরিয়ান (আল কাজউনি)।
৭. কজ্বিনি—বাদশাহ নামা, মুলক খাস।
৮. চাঁদ বরদাই—পৃথ্বীরাজ রাসো।
৯. থ্রি ডক্টর্স—অ্যান অ্যাডভান্সড্ হিস্টোরি অব্ ইণ্ডিয়া।
১০. নাজিম—সুলতান মামুদ।
১১. প্রোফেসর কে. এস. লাল—গ্রোথ অব্ মুসলিম্ পপুলেশন ইন্ ইণ্ডিয়া।
১২. ফারনান্দ ব্রৌডেল—এ হিস্টোরি অব্ সিভিলাইজেশান।
১৩. ফিরিস্তা ও হাজি-অদ্-জাহির—আরবিক হিস্টোরি অব্ গুজরাট।
১৪. বার্নিয়ার—ট্রাভেল।
১৫. ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ—আকবর, অক্সফোর্ড হিস্টোরি।
১৬. রমিলা থাপার—ভারতবর্ষের ইতিহাস।
১৭. সোয়েল—এ ফরগেটেন্ এম্পায়ার।
১৮. হাবিব—সুলতান অব গজনী।
১৯. এন্. সি. ই. আর্. টি—মেডাইভাল্ ইণ্ডিয়া।

Scanned by CamScanner

নির্ঘণ্ট

অন্ধকূপ হত্যা, ৭৭
অসামান্যা, ৭৬
আকবর, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৫১
আকবরের স্ত্রী সকল, ৪৫
আগানেস, ৮৩
আজম শাহ, ৭৫
আতাউল্লা, ৭৪
আদম খান, ৪৬
আনন্দ চাঁদ, ৭৫
আমীনা বেগম, ৭৫
আমীর খসরু, ২৫
আরাকান, ৬১
আলাউদ্দিন খলজী, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৫২
আলতুনিয়া, ২১
আলবেরুনী (রিহান), ৯, ১০
ইউরোপ, ৮৩
ইবন বতুতা, ৩৪
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ৭৩, ৭৭, ৭৮
ইস্তাম্বুল, ৮৩
উতবি, ১১
উমিচাঁদ (আমীন চাঁদ) ৭৭
উন্নিচার্য, ৮২
এলিজাবেথ, ৪৭
ওটোম্যান, ৮৩
ওয়াশেক আলী, ৭৮
ওয়ারেশ আলী, ৭৮
ঔরঙ্গজেব, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২
কবীর, ৩৬
কমলাদেবী, ২৬
কলোনেল্ ফুলার্টন, ৬২
ক্লাইভ, ৭৭, ৮০
কাজেম আলি মির্জা, ৭৮
কাসিমবাজার, ৭৫, ৭৭
ক্রিস্টোফার বায়াস, ৪৮
কোহিনুর, ৫৫, ৫৬
খিজির খাঁ, ১৯
গিয়াস মহম্মদ, ৪৫
ঘসেটি বেগম, ৭৫
চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, ৮৩
জগৎ শেঠ, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭
জয় সিং, ৬১
জহরব্রত, ২৫
জামালুদ্দিন ইয়াকুত, ২১
জামোরিন দুর্গ, ৮১
জয়পাল, ১১
জাহাঙ্গীর, ৪৭
জাহাঙ্গীরের স্ত্রী সকল, ৪৮
জেব্-উন্-নিসা, ৬৩
টাইগার অব্ মাইশোর, ৮০
টিপু সুলতান, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩
টিপুর তলোয়ার, ৮০
তাজমহল, ৫৫
তৈমুরলঙ্গ, ১৯
থালিপ্পারাম্পু মন্দির, ৮০
থিরিবাঙ্গতু মন্দির, ৮০

Scanned by CamScanner

ত্রিচম্বরম মন্দির, ৮০
দন্ডক, ৭৭
দয়াচাঁদ, ৭৫
দ্যা রেপ্ অব প্রোজারপাইন, ৮৩
দারা, ৫৮, ৫৯, ৬০
দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, ৮২
দেওয়ান পূর্নৈয়া ও তাঁর কন্যা, ৮২
দেবদাসী, ১২
দেবলাদেবী, ২৭
নাজর, ৬০
নাদির শাহ, ৫৬
নানক, ৩৭, ৩৮
নামদেব, ৩৬
নেপোলিয়ান, ৮০
পদ্মিনী, ২৪, ২৫
পলঘাট দূর্গ, ৮০
পলাশী, ৭৭
পার্সিফোনি, ৮৩
পিটার মাণ্ডি, ৫১, ৫২
পোনমেরি মন্দির, ৮০
পোস্ত, ৬১
পৃথ্বীরাজ, ৩০
ফতেচাঁদ, ৭৪
ফতিমা-ফকর্ উন্নিসা, ৮০
ফারুক শারিয়ার, ৭৪
ফোর্ট্ উইলিয়াম, ৭৭
বজবাহাদুর, ৪৫, ৪৬
বার্ণিয়ার, ৫৯
বাবর, ৩৯
বাদৌনি, ৪১
বাহাদুর শাহ, ৬২, ৬৩
বিজয়নগর, ৩২
বীরবল (মহেশ দাস), ৪৫
বেবাদল খান, ৫৬
বৈরাম খাঁ, ৪১
ভগবান দাস, ৪৫
ভাস্কর পণ্ডিত, ৭৫
মইজুদ্দিন, ২১
মহতাব রায়, ৭৫
মহম্মদ আকবর, ৬১
ময়ূর সিংহাসন, ৫৬
মানিকচাঁদ, ৭৪
মামুদ, ১০
মামুদ খলজী, ৩৩
মালিক কাফুর, ২৬, ২৭, ২৮
মীরজাফর, ৭৭, ৭৮
মীরমদন, ৭৭
মীরন, ৭৮
মুয়াজ্জম, ৬৩
মুর্শিদকুলি খাঁ, ৭৪
মেনকা, ৮৩
মেহেরুন্নিসা (নূরজাহান), ৪৮, ৫০
মোমিনা বেগম, ৭৫
মোহনলাল কাশ্মীরি, ৭৭
যদুনাথ সরকার, ১৮
রকেট, ৮১
রঘুজি ভোসলে, ৭৫
রণজিৎ সিং, ৫৬
রম্ভা, ৮৩
রাই করণ, ২৬
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ৭৭

রাজা টোডরমল, ৪৫
রূপমতি, ৪৬, ৪৭
লক্ষ্মীকান্ত মন্দির, ৮২
শাহজাহান, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭
শাহসুজা, ৫৬
শের আফগান, ৪৭
শেরিঙ্গপতম, ৮৩
শ্রীঙ্গেরী মঠ, ৮২
সংযুক্তা, ৩০
সতীদাহ, ৯
সরফরাজ খাঁ, ৭৪
সিফিয়ার শুকো, ৫৮, ৫৯, ৬০
সিরাজউদ্দৌলা, ৭৩, ৭৫, ৭৬
সুজা, ৬১
সুজাত খান, ৪৫
সেভেল, ৩৩
সোমনাথের মন্দির, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ২৬
সৌকতজঙ্গ, ৭৫
স্বরূপচাঁদ, ৭৫
স্বামী হরিদাস, ৪৫
হজরত মহম্মদ, ১৫
হায়দার আলী, ৮০
হুমায়ুন, ৪১
হুসেন কুলী খাঁ, ৭৭

Scanned by CamScanner

গ্রন্থকার

জনার্দন মণ্ডল জন্ম ১৯৪৯, সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদীর জঙ্গলাকীর্ণ শাখা নদী গোমতীর উত্তর তীরে পাঠঘরা গ্রামে, অঙ্কশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। পরে তাঁর কর্মজীবন অন্য খাতে প্রবাহিত হয়। ১৯৭৬-এর 'ডব্লিউ. বি. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী চাকরিতে যোগদান। মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরী। চাকরীরত অবস্থায় এল. এল. বি. অধ্যয়ন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদস্থ পদে চাকরীর পর মিউনিসিপ্যাল অ্যাকায়ার্স ডিপার্টমেণ্ট এবং পরে বিচারবিভাগে কনজিউমার্স ফোরামে মেম্বার ও প্রেসিডেন্ট-ইন্-চার্জ হিসাবে বিচার কার্য সম্পন্ন এবং ভারতীয় মানবাধিকার রক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান।

হুগলী ডাক, নির্ভিক সংবাদ ও Shine প্রভৃতি পত্রিকার লেখক হিসাবে মূল্যবান প্রবন্ধের রচিয়তা, ইংরাজী ও বাংলায় প্রবন্ধ, কবিতা, ছোট গল্প এবং গ্রন্থ রচিয়তা।

'মধ্যযুগে শাসককুলের বর্বরতা,—গ্রন্থটি অনেক আগে লেখা হলেও সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল।

Scanned by CamScanner